ত্রৈমাসিক

# ইসলামী আইন ও বিচার

ঃ ৪ ॥ সংখ্যা ঃ ১৫ ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

ISSN 1813-0372

# ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813-0372

# ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

# ISLAMI AIN O BICHAR


## ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১৫

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৮



যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি পুরানা পল্টন
নোয়াখালী টাওয়ার, সুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২
ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬, ০১৭১১ ৩৪৫০৪২
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com



প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

---

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

## সূচিপত্র

# কুরআন একটি অসাধারণ কিতাব এবং মানুষের জন্য আইন গ্রন্থ

মানুষ বই লেখে। কল্পনা করে, চিন্তা ভাবনা করে, যোগ বিয়োগ হিসাব নিকাশ যাচাই বাছাই করে এবং লেখে। মানুষ বই লেখে, অনেক বড় বড় বই লেখে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী বই মানুষ লেখে যা সময়ের ধারা ও গতি পালটে দেয়।

কিন্তু মানুষের লেখা বই নয় এমন কিছু বই আছে মানুষের কাছে, সেগুলোর মধ্যে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য, অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ বিকৃতিমুক্ত গ্রন্থটি হচ্ছে আল কুরআন। আল কুরআন আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পাঠানো কিতাব। আল্লাহ তাঁর প্রধানতম দূত জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কিতাবটি পাঠান। একটা লিখিত বা ছাপানো বই আকারে এটা পাঠাননি। বরং জিব্রীল আলাইহিস সাল্লামের মাধ্যমে আসমান থেকে পৃথিবীর পরিবেশে নাযিল করেন। জিব্রীল আল্লাহর এ বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালবে ও স্মৃতি কোষে নাযিল ও গ্রথিত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা মুখস্থ করেন এবং বিভিন্ন আধারে লিখিয়ে নেন।

এভাবে একদিনে নয়, তেইশ বছর ধরে ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আল্লাহর এ বাণী নাযিল হতে থাকে। শেষে আল্লাহ বললেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (আল মায়েদা ঃ ৩)

এখানে আল্লাহর এ বাণী কুরআনকে দীন, নিয়ামত ও ইসলাম বলা হয়েছে। আবার অন্য কথায় বলা যায় পূর্ণাঙ্গ দীন ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ামতকে ইসলাম বলা হয়েছে। নিয়ামত মানে আল্লাহর অনুগ্রহ। মানুষের জন্য পৃথিবীতে যতগুলো উপকারী জিনিস আছে সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। তার মধ্যে কুরআন সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। বরং অনুগ্রহের আধার। কারণ কুরআন মানুষকে পৃথিবীতে চলার ও জীবন যাপন করার পথ দেখায়। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনে। মানুষ যে বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির কারণে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জীব থেকে আলাদা সেই বিবেক ও-বুদ্ধিবৃত্তির মুখে কুরআনের লাগাম ছাড়া মানুষ বিবেকহীন ও বুদ্ধিভ্রষ্ট। মানুষের

কিসে কল্যাণ ও কিসে অকল্যাণ তা বুদ্ধি নয়, একমাত্র কুরআনই নির্ধারণ করতে পারে। বড় বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের বুদ্ধির কর্ম। কিন্তু কুরআন এই কর্মের কল্যাণকে চিহ্নিত করে একে মানুষের জন্য নিয়ামতে পরিণত করে। যেখানে বুদ্ধি কুরআনের এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া মুক্ত সেখানে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও কল্যাণ নয় বরং মহা অকল্যাণে পরিণত হয়। তাই যে জাতি ও মানব গোষ্ঠীর কাছে কুরআন নেই এবং যে সভ্যতা কুরআন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত নয় তা মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। ইতিহাসে কুরআন পূর্ব মানুষের সভ্যতাগুলোকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। আল্লাহর বাণীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবার পর সেগুলো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কুরআন যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল সেটি এখনো টিকে আছে এবং কুরআন এখনো অবিকৃত থাকার কারণে যুগের আবর্তনে তার সভ্যতার যতটুকু সত্য বিচ্যুতি ঘটেছিল তার বিভ্রম কাটিয়ে উঠে আধুনিক যুগ প্লাটফরমে আবার নতুন করে উজ্জীবিত হচ্ছে। তার শির্‌ক বিমুক্তি[১] ও শালীনতা বিযুক্তি[২] আবার বিশ্ব মানবতাকে নতুন জীবন রসে সঞ্জীবিত করে তুলছে।

আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কুরআন যে ইসলামকে পেশ করছে তা বিশ্বকে একটা আইনী ব্যবস্থা দান করেছে। মানুষের সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি, মানুষের জীবন ধারা, মানুষের সমস্ত কর্মকান্ড, তার অর্থনীতি রাজনীতি এবং বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয়াবলী যে বিধান ও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও পরিশীলিত হবে তার কাঠামো কুরআন নির্ণয় করে দিয়েছে।

কুরআন মানুষের চরিত্র সূচিশুদ্ধ, পরিমার্জিত ও সুন্দর করার জন্য নৈতিক বিধান দিয়েছে। তাকে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে মহিমান্বিত করার জন্য ক্ষমা, মহানুভবতা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পালন, পরোপকার, আমানতদারী ইত্যাদি নৈতিক বিষয়াবলীকে একটি নৈতিক বিজ্ঞানের অন্তরভুক্ত করেছে এবং একে সিব্‌গাতুল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলী আখ্যা দিয়েছে। এ সংক্রান্ত উচ্চতর গুণাবলী অর্জন করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছে।

মানুষের সাথে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্বের সম্পর্ককে কুরআন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। ব্যক্তি মানুষের সাথে ব্যক্তি মানুষের ও গোষ্ঠীর আচরণ ও আর্থিক লেনদেন, ব্যবসায়িক চুক্তি, ক্রয় বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক, অংশীদারিত্ব, বিনিময় ভিত্তিক কাজ, বিবাদ নিস্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক বিধান দিয়েছে। অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান দিয়েছে, যেগুলোকে আইনের পরিভাষায় 'দণ্ডবিধি' বলা হয়। এর ফলে সমাজে মানুষের সহাবস্থান এবং রাষ্ট্রে তার তৎপরতা ও কার্যক্রম নিরাপদ ও শান্তি পূর্ণ হয়। বিচার ব্যবস্থা, আদালত ও প্রশাসন এবং ব্যক্তির সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক

ও রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ ও বিধিবদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের এবং নির্দিষ্ট ও ব্যাপক বলয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিধান লিপিবদ্ধ করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গনে কুরআনে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় মানুষের সাথে আচরণ ও লেনদেন এবং এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্ক রক্ষার মূলনীতিগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআনে সাংবিধানিক আইন, শাসন ব্যবস্থা ও তার মৌল আদর্শ সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ধনীর সম্পদ, আয়ের উৎস ও ব্যয় খাতের শৃঙ্খলা বিধান, রাষ্ট্র ও নাগরিকের এবং ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কুরআন পারিবারিক আইন, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সংক্রান্ত বিধান দিয়েছে। মানুষের অধিকার সংরক্ষণে এবং ব্যবসায়িক কাজ কারবারে ওজন ও পরিমাপ সঠিক রাখার অন্যকথায় কোনো প্রকার হেরফের ও জালিয়াতি না করার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

এভাবে বিচার করলে আমরা দেখবো কুরআন দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ আইন গ্রন্থ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে। আজ চৌদ্দশ বছর থেকে এই আইনের ওপর গবেষণা করে একে রাষ্ট্রে, সমাজে ও ব্যক্তি পরিসরে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বারো তেরো শ' বছর ধরে বিশ্বের একটা বিশাল অংশ এ আইনে শাসিত হওয়াই এর দীর্ঘ জীবন ক্ষমতার লক্ষণ। শত শত বছরের নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবন ক্ষেত্রকে এ আইন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যার ফলে আজও বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে এর কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা এবং আইন ও বিধান পাওয়া যায়।

**গ্রন্থপঞ্জি**

১. ইন্নাশ শির্কা লাযুল্মুন আযীম–শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম তথা সবচেয়ে বড় গুনাহ। (সুরা লুকমান ঃ ১৩)

২. ওয়া ইযা মার্রু বিল লাগ্বি মার্রু কিরামা–আর অশালীন কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে মর্যাদার সাথে সে স্থান অতিক্রম করো। (সুরা আল ফুরকান ঃ ৭২)

- আবদুল মান্নান তালিব

*ইসলামী আইন ও বিচার*
*জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮*
*বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ৯-৩২*

# আইনের মূলনীতি শাস্ত্র[১] ও ইজতিহাদ[২]

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
*অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ রাশেদ*

আইনের মূলনীতি শাস্ত্র এমন একটি বিষয় যা নিয়ে মুসলমানগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই গর্ববোধ করতে পারেন। মানবেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি আইন শাস্ত্রে তাদের নিজস্ব কিছু না কিছু উপাদানের সংযুক্তি ঘটিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের সংযোজন। বস্তুত ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আইন শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আইনের মূলনীতি শাস্ত্র (Principle of jurisprudence) পৃথিবীর কোথাও ছিল না। এমন কি আজও আমা দাবী করতে পারি, এটি একমাত্র মুসলমানদেরই স্বতন্ত্র অবদান, যারা মূলত আইন শাস্ত্রের এক বিরাট শূন্যতাকে এর মধ্য দিয়ে পূরণ করেছেন।

এটি সর্বজন বিদিত যে, প্রতিটি সমাজের নিজস্ব আইন বা বিধান রয়েছে এবং এই আইন মূলত দু ধরনের। প্রথমটি হচ্ছে অলিখিত আইন বা বিধান, যেটি মূলত প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির সমষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রতিটি সমাজে এ ধরনের আইনের অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা জানিনা কে বা কারা এগুলোর প্রণেতা বা সংকলক; কিন্তু আমরা সকলেই এগুলো মেনে চলি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোন রাজা বা শাসক কর্তৃক সৃষ্ট বা আরোপিত আইন এবং এটি মূলত লিখিত আকারে বিদ্যমান থাকে। যে প্রকারের আইনই হোক না কেন, মানুষ তার প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী তারই প্রয়োজনে আইন তৈরি করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, আইন হচ্ছে প্রতিটি মানব সমাজের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

লিখিত আইনের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম যে আইনের নমুনা আমাদের কাছে আছে সেটি হচ্ছে ইরাকের প্রাচীন রাজা হামুরাবির আইন। সর্ব সাম্প্রতিক পশ্চিমা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইনিই রাজা নিমরোজ। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম আ. এর সমসাময়িক (১৮০০ খ্রিস্ট পূর্ব)। ইরানে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের অংশ হিসাবে সাম্প্রতিক খনন কাজের সময় সুস নামে এক স্থানে দুটি মানব দেহ খুদিত একটি কালো

---

*লেখক ঃ জন্ম সূত্রে ভারতীয়। ১৯৪৭ এর আগে উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্স গিয়ে ১৯৪৭ এরপর হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে আর ফিরে আসেননি। ফরাসী সরকার তাকে সম্মানজনক নাগরিকত্ব দেয়। তিনি বরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক।*

*অনুবাদক ঃ হাফেজ, আলেম। এম. এস. এস ঢাবি। জরিপ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সার্চ (SURCH)-এর কর্মকর্তা।*

পাথর আবিস্কৃত হয়। এ দুটি দেহের একটি সৃষ্টিকর্তার এবং অন্যটি রাজা হামুরাবির প্রতিরূপ বলে ধারণা করা হয়, যাকে ঐ ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আইন লাভ করছেন। এ পাথরটি একটি স্তম্ভের আকৃতির, যাতে মাইখি হস্তলিপিতে আইনের বিভিন্ন ধারা উৎকীর্ণ রয়েছে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি এগুলোর মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছেন এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় এটি অনূদিতও হয়েছে।

এটি একটি তাৎপর্যময় ব্যাপার এ জন্য যে, এটিই প্রাচীনতম লিখিত আইনের দৃষ্টান্ত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এটি সর্বোৎকৃষ্ট আইনও বটে। আপনাদের সামনে এ বিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। হামুরাবি আইনে 'যেমন কর্ম তেমন পরিণাম' এর বিধানকে একটি বুনিয়াদি নিয়ম বা মূলনীতি হিসাবে স্থান দেয়া হয়। কিন্তু রাজা হামুরাবির পারিষদ এ বিধানটিকে এক উদ্ভট পর্যায়ে সম্প্রসারিত করেন। ফলে তা এমন বিধানে পরিণত হয় যে, যদি কেউ কারো গরু হত্যা করে তবে তার শাস্তি স্বরূপ অপরাধীর মালিকানাধীন গরু হত্যা করতে হবে। এভাবে যাকে তার গরু থেকে বঞ্চিত করা হলো তাকে এর ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সমাজের উপর আরো একটি প্রাণী ধ্বংসের ক্ষতি চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু গরুর বদলে গরু ধবংস- এটিই এখানে নির্ধারিত শাস্তির বিধান।

উপরোক্ত ধরনের আরেকটি বিধান ছিল এরূপ, যদি কোন ব্যক্তি কারো কন্যাকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকে শাস্তি দানের পরিবর্তে হত্যাকারীর কন্যাকে, সে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, হত্যা করতে হবে। কারণ 'যেমন কর্ম তেমন বদলা' কথাটির অর্থই হচ্ছে কন্যার বদলে কন্যা হত্যা! (অতএব কন্যা হত্যার বদলায় কন্যা হত্যা করতে হবে!) এ যেন 'ইটের বদলে পাটকেল' এর উদাহরণ। এভাবে দেখা যাচ্ছে, আইনের একটি মৌলনীতিকে রাজা হামুরাবি'র আইনের নেপথ্যে রূঢ়তার সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছিল এবং একে একটি অযৌক্তিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও এখন আমাদের সাধারণ বোধ (Common sense) এ ধরনের মূলনীতিকে গ্রহণ করতে চাইবে না, কিন্তু চার হাজার বছর আগের মানুষ একে একটি ভালো ও যথার্থ আইন বলেই মনে করেছে, যা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে বলে তারা ধারণা করেছে।

রাজা হামুরাবি'র আইনের উদাহরণ ছাড়াও আমরা আরো অনেক প্রাচীন আইন সম্পর্কে জানি। যেমন প্রাচীন মিশরের গূঢ় শিলালিপি এ ধরনের কিছু আইনকে ধারণ করেছিল। এ ছাড়া পরবর্তীতে ছিল রোমান, গ্রীক, চীনা এবং ভারতীয় আইন। তেমনি রেড ইন্ডিয়ানদের রয়েছে তাদের নিজস্ব আইন। মোট কথা, আমরা প্রতিটি সংস্কৃতি ও প্রতিটি দেশেই আইনের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। মূলত সবখানেই সুনির্দিষ্ট আইনের দৃষ্টান্ত ছিল, কিন্তু কোথাও আইনের মূলনীতি শাস্ত্র বলে কোন কিছু ছিল না। আইন হিসাবে যা পাওয়া যেত, সেটি মূলত ছিল নিছক কিছু 'করণীয় ও বর্জনীয়' এর তালিকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে সবখানেই আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের অভাব ছিল লক্ষণীয়। বস্তুত সেখানে আইনের প্রকৃতি বা কিভাবে আইন সৃষ্টি হচ্ছে অথবা কিভাবে এতে পরিবর্তন এবং সংশোধনী আনা হচ্ছে- এ সব বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা বা বিতর্ক ছিল না। কিভাবে আইনকে ব্যাখ্যা করা হবে অথবা দুটি বিধানে কোন ভাবে বিরোধ দেখা গেলে কিভাবে সমাধানে পৌঁছুতে হবে এসব বিষয়েও ছিল না কোন নির্দেশনা। মোট

কথা, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কোন জাতির ইতিহাসে আইনের সাথে সম্পর্কিত এর তত্ত্ব বা ধারণা (Theory or concept of law) বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

**আইনের মূলনীতি শাস্ত্র**

আইনের মূলনীতি তত্ত্ব একটি শাস্ত্র হিসাবে কেবল ইসলামী আইনেই নয় পৃথিবীর যে কোন আইনের ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য। কেননা এর রয়েছে সার্বজনীন আবেদন ও প্রয়োগযোগ্যতা। মূলনীতি তত্ত্বের জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান কি রোমান, কি গ্রীক, কি হিন্দু অথবা চীনা ইত্যাদি যে কোন আইনই হোক না কেন, বের করা যেতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আপনি আইন বলতে কী বুঝেন? কে আইন সৃষ্টি করে? কিভাবে এবং কখন আইন সৃষ্টি করে? কিভাবে আইন পরিবর্তন করা হয়? কিভাবে এতে সংশোধন আনা হয় বা কিভাবে একে রদ করা হয়? আইনের মৌলিক নীতি-নিয়মগুলোই বা কী? এগুলোর উত্তর বিভিন্ন রূপ হতে পারে, কিন্তু মুসলমানগণই প্রথমবারের মত আইনের পেছনের অন্ত র্নিহিত এ সব তত্ত্ব ও ধারণা সম্পর্কিত শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। একে তারা বলেন 'উসূলুল ফিকহ'। এই নাম কেন দেয়া হয়েছে তা আমরা জানি না। আমরা কেবল এ বিষয়ে অনুমান করতে পারি। পবিত্র কুরআন শরীফের একটি বিখ্যাত আয়াতের উপর ভিত্তি করে আমরা এ বিষয়ে এ অনুমানটি করতে পারি। কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'সৎ বাক্যের[৩] উপমা হচ্ছে উৎকৃষ্ট একটি বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বলোক পর্যন্ত বিস্তৃত (১৪:২৪)।'

এ আয়াতে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- মূল ও শাখা। আমাদের মুসলিম আইনজ্ঞগণ আইনের মূলনীতি শাস্ত্রকে এভাবে আইনের মূল (আস্ল্) হিসাবে এবং আইনশাস্ত্রকে এর শাখা (ফুরু') হিসাবে গণ্য করেছেন। বস্তুত উসূল শব্দটির আভিধানিক বা শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'মূল'। এর ভিত্তিতেই ব্যবহারিক আইনের মৌলনীতি ও ধারণা (Principles and concepts of law of conduct) বিকশিত হয়েছে।

ব্যবহারিক আইনের মৌলনীতি ও ধারণা বিষয়ক প্রাচীনতম যে সমস্ত লিখিত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর সবগুলোই লিখেছেন মুসলিম আইনজ্ঞগণ। গত শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এ বিষয়টি স্পর্শ করেনি। ১৯২৮ সনে এ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় একজন ফরাসী অধ্যাপকের লিখিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর নাম ছিল Angora Reform, লেখক কাউন্ট অস্ট্রোরগ। মূলত এটি ছিল 'ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন' এর শতবার্ষিকী উৎযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত তাঁর তিনটি বক্তৃতা বা পেপারের সমষ্টি। প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম ছিল Angora Reforms. তৎকালীন তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক যে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন মূলত Angora Reforms ছিল এ সম্পর্কিত বক্তৃতা। কামাল পাশা, যেমনটি আমরা জানি, তুরস্কে ইসলামী আইন বাতিল করে দিয়ে সেখানে সুইস ও ইটালিয়ান আইন চালু করেছিলেন। তিনি তুর্কি টুপি ব্যবহার বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ইউরোপীয় হ্যাট ব্যবহার চালু করেছিলেন। সে সময় নতুন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় উপরোক্ত ধরনের সংস্কারকে ঘিরে এ বক্তৃতা আবর্তিত ছিল। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল Roots of Law. স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি আমার নিজের জাতির ঐতিহ্য (অর্থাৎ আইনের মূলনীতি শাস্ত্র) সম্পর্কে এই বক্তৃতাটি পড়েই প্রথম অবগত

হই। এ বক্তৃতায় কাউন্ট অস্ট্রোরগ লিখেন, আইনের মূলনীতি শাস্ত্র ছিল বিশ্বকে প্রদত্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে এক অনন্য উপহার।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে রসূলুল্লাহ স. এর নবুওয়ত লাভের ঘোষণার পর থেকেই ইসলামী আইন সূত্রবদ্ধ করার সূচনা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কা নগরীতে প্রচলিত কিছু আচরণ ও রীতিনীতির সমষ্টি ইসলামী আইনের প্রাথমিক একটি অংশ তৈরি করে। পরবর্তীতে রীতিপ্রথা ও আচরণ-নির্ভর আইন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হতে থাকে। কিছু অন্যান্য উপাদান যেমন বিভিন্ন পক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ধারাসমূহ এবং পূর্বতন নবীগণের কিছু কিছু বিধিবিধানও এতে ধারণ করা হয়।

কিন্তু রসূলুল্লাহ স. এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে আইনের প্রধান একটি উৎস (অর্থাৎ হাদীসের ধারা) বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে অহী'র মাধ্যমে আইন তৈরি বা আইনের পরিবর্তনের সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়। এখন রসূলুল্লাহ স. যা রেখে গেছেন সেটুকু নিয়েই প্রত্যেককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সাধারণ ভাবে এ ধরনের অবস্থা যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতো, কিন্তু আইন যিনি সৃষ্টি করেন তিনি (আল্লাহ) এবং তার বাণী বাহক (রসূলুল্লাহ স.) আমাদের শিখিয়েছেন, আমরা কিভাবে এ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াব। বস্তুত এ ক্ষেত্রে সমাধান নিহিত ছিল রসূলুল্লাহ স. এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে। সে সময় তিনি হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে রা. ইয়েমেনের প্রশাসক (গভর্নর) নিয়োগ করেন। তখন তিনি হযরত মুয়াযের রা. কাছে জানতে চাইলেন তিনি সেখানে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। জবাবে হযরত মুয়ায রা. জানালেন, 'আল্লাহর কালাম থেকে' তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রসূলুল্লাহ স. পুনরায় জানতে চাইলেন, 'যদি সেখানে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা না পাও, তবে কী করবে?' মনোনীত-গভর্নর হযরত মুয়ায রা. বললেন, সে ক্ষেত্রে তিনি রসূলুল্লাহ স. এর সুন্নাহ অবলম্বন করবেন। আল্লাহর রসূল স. আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যদি সেখানেও সমাধান খুঁজে না পাও?' হযরত মুয়ায বললেন, সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাধ্যমত সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত বিচারবোধকে কাজে লাগাবেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর এ জবাব অনুমোদন করেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দুআ করেন, আকাশের দিকে তাঁর হাত দুটি উঠিয়ে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আপনার রসূলের রসূলকে (প্রতিনিধিকে) যে নিয়ামত দিয়েছেন সে জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' বলা বাহুল্য, কোন বিষয়ের অনুমোদন এর চেয়ে মহৎ ও স্পষ্ট ভাষায় আর হতে পারে না।

**ইজতিহাদ**

মূলত এ মৌলনীতিই ইসলামী আইনে প্রাণ সঞ্চার করেছে ও একে স্থায়ীত্ব এনে দিয়েছে। এর ফলে প্রয়োজনের মুহূর্তে ইসলামী আইন সর্বদাই এ নীতির সাহায্য নিতে পারে। বস্তুত যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই এ কথা স্বীকার করবেন যে, প্রধানত এ নীতির কারণেই ইসলামী আইন ১৪০০ বছর ধরে কার্যকর রয়েছে এবং এখনও এটি উন্নততর ও বিকশিত হবার ক্ষমতা রাখে। এমন হওয়া অসম্ভব কিছু নয় যে, কিছু লোক কুরআন ও হাদীস থেকে কোন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পেরে

কখনো কখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারে। আবু হানিফা রহ. সম্পর্কিত একটি উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ইমাম আবু হানিফার রহ. বুদ্ধিমত্তার তারিফ করা এ উদাহরণ দেয়ার উদ্দেশ্য নয়, বরং এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলাই এখানে উদ্দেশ্য যে, অনেক সময় কোন বিষয়ে কেউ কেউ যেখানে সমাধান সম্পর্কে নিজেই ধারণা লাভ করতে পারে, সে বিষয়েই অনেকে হয়ত কোন কিছু অনুমান করতেও ব্যর্থ হয়।

এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনার কথা বলা যায়। ঘটনাটি এরূপ–

একবার এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। রাতে স্বামী আল্লাহর নামে শপথ করে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে বসল, ভোর হওয়ার আগে যদি স্ত্রী তার সাথে কথা না বলে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে। স্ত্রীও ছিল তখন অত্যন্তবিরক্ত। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে স্বামীকে বলল, সে ভোরের আগে তার সাথে কোন কথা বলবে না। এ কথা বলার পর দুজনের কেউ ভোর হওয়া পর্যন্তকোন কথা বলল না। এভাবে এক সময় রাত কেটে গেল। মুয়াযযিন মুমিন বান্দাদেরকে ফজরের নামাযের জন্য আহবান জানালেন। স্বামী মসজিদে গেল নামায আদায়ের জন্য এবং নামাযের পর বিখ্যাত ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ হযরত ইবনে সিরিন রহ. এর কাছে গেল। হযরত ইবনে সিরিন বললেন, তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। তিনি আরো বললেন, এর জন্য স্বামীই দায়ী। কেননা ভোর হওয়ার আগে নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলার শর্ত স্বামীই আরোপ করেছিল। এখন যেহেতু স্ত্রী এ শর্ত পূরণ করেনি, অতএব তালাক কার্যকর হয়ে গেছে।

গভীর হতাশা নিয়ে স্বামী এবার গেল হযরত আবু হানিফা রহ.এর কাছে। তাঁর কাছে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত খুলে বলল। বিবরণ শুনে আবু হানিফা রহ. বললেন, 'কোন ব্যাপার নয়। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারেন। কারণ তালাক কার্যকর হয়নি।' এ কথা শুনে স্বামী কিছুটা হতবুদ্ধ হয়ে পড়ল। (যেহেতু দুজন আইনজ্ঞ দু রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ফলে কোনটি সে গ্রহণ করবে বুঝতে পারল না।) সে আবার ইবনে সিরিন রহ. এর কাছে গিয়ে আবু হানিফার রহ. সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁকে জানালো। আবু হানিফার রহ. সিদ্ধান্ত শুনে এবার ইবনে সিরিনও অবাক হলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আবু হানিফার রহ. কাছে গেলেন বিষয়টি বুঝার জন্য। তিনি বিষয়টি নিয়ে আবু হানিফার রহ. সাথে আলোচনা করলেন এবং যুক্তি দেখিয়ে বললেন, আইন অনুযায়ী তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। কাজেই এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে ফিরে যায় এবং তার সাথে থাকে তবে সে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এবং এ অপরাধের জন্য দায়ী হবেন ইমাম আবু হানিফা। কেননা তিনিই স্বামীকে বিভ্রান্ত করেছেন। আবু হানিফা রহ. স্বামী ব্যক্তিটির দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি তাকে ঘটনাটি আবারো বর্ণনা করতে বললেন। লোকটি ঘটনাটি দ্বিতীয়বার সবিস্তারে বলল। এবার আবু হানিফা রহ. তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করে বললেন, তালাক হয়নি। কারণ কী ধরনের কথা বলতে হবে লোকটি সে সম্পর্কে তার স্ত্রীকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। (অর্থাৎ স্ত্রী যে কোন রকম কথা বললেই কথা বলার শর্ত পূরণ হয়েছে বলা যাবে।) স্ত্রী তার স্বামীর ঐ কথার জবাবে বলেছিল, সে-ও তার সাথে কথা বলবে না। এ কথা বলার দ্বারাই স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে ফেলেছে। এর ফলে স্বামী যে শর্ত দিয়েছিল ভোর হবার আগে স্ত্রী কথা না বললে তালাক হয়ে যাবে সেটি এখানে ঘটেনি।

কিভাবে দুজন ব্যক্তি একই ঘটনাকে দু ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন এ ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। একজন এখানে ঘটনার কোন একটি সূক্ষ্ম দিক ধরতে পেরেছেন, যেটি অন্যজনের নজর এড়িয়ে গেছে। ইসলামে যদি ইজতিহাদের অনুমতি না থাকতো তবে ইসলামী আইন শুধু কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সীমিত থাকতো। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, জাতির শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হতে পারেন যা হয়ত নতুন কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন। সে ঘটনার কথা মনে করুন, যখন হযরত উমর রা. এর গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত উমর রা. মনের অজান্তে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'যদি আজ আলি রা. না হতেন, তবে আমি উমর ধ্বংস হয়ে যেতাম।'[৪]

অন্যদিকে হযরত মুয়াযকে রা. নিজের বিচারবোধ বা মতামতকে কাজে লাগানোর জন্য যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা আমাদেরকে এমন একটি মূলনীতির সন্ধান দিয়েছে যা নানা ধরনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করেছে।

খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে কোন নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সমষ্টিগত ভাবে পরামর্শ গ্রহণ ও বিচার পর্যালোচনার ঘটনা হঠাৎ হঠাৎ ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনের মধ্যে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেখা গেছে, একজন যদি এক ধরনের মত প্রকাশ করেছেন, তবে আরেকজন ঐ মতের বিপক্ষে সমালোচনা করে ঐ বিষয়ে তার নিজের মতটি উপস্থাপন করেছেন। এভাবে কোন সমস্যা বা প্রশ্নের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ও দলিলসমূহ পর্যালোচনা করে পন্ডিতগণ ঐ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়াটি সে সময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ হলো সে সময় পর্যন্ত রসূলুল্লাহ স. এর উক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ ব্যাপক ভিত্তিক উপায়ে সংগ্রহ ও সংকলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লোকজন এগুলো কেবল তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদের মত ব্যক্তিত্বের হাতে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিগণ যখনই কোথাও সমবেত হয়েছেন তখনই তাঁরা যে কোন বিষয়ে রসূলুল্লাহর স. যে সমস্ত উক্তি রয়েছে সেগুলো স্মরণ করেছেন। এভাবেই ইসলামী আইনের নির্দেশনা সম্বলিত হাদীসের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংকলিত হতে শুরু করে। পাশাপাশি এ সময় এসব উৎসের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিচারিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যুগেরও সূচনা হয়।

### কুফার শিক্ষায়তন

এভাবে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে আইনের মূলনীতি তত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্রে এভাবে এ আইন সংগ্রহ ও সার-সংগ্রহ আকারে সেগুলোকে গ্রথিত করতে বর্ণিত কেন্দ্রগুলো সাহায্য করে। এ সব কেন্দ্রের মধ্যে কুফার শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। বস্তুত বর্তমান ইরাকে কুফা নগরীটি যেখানে অবস্থান করছে, প্রাচীন কালে এর পাশের শহর ছিল হীরা নগরী। এ হীরা নগরীকে ইসলাম-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কেন্দ্র বলে মনে করা হতো। যদিও নগরীটি পারসিকদের দ্বারা শাসিত ছিল, কিন্তু সেখানে আরবের লোকজন গিয়ে

বসতি স্থাপন করে। সেকালে প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ইয়েমেন নগরী। এখানকার ভূমি ছিল আরব উপদ্বীপের মধ্যে উর্বরতম। এ নগরী থেকে আরবরা যখন হীরা নগরীতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন তাদের সভ্যতা সেখানকার আশেপাশের এলাকায় প্রভাব সৃষ্টি করে। ইতিহাসের এ এক আশ্চর্য সত্য ঘটনা যে, পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট তাঁর সন্তানকে শিক্ষালাভের জন্য হীরা নগরীতে প্রেরণ করেছিলেন। সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আরব শাসকদের তত্ত্বাবধানে সেখানে তাঁর সন্তানকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেটি তার চরিত্রকে গড়ে তুলতে বিপুল ভাবে সাহায্য করবে। সম্রাটের ধারণা সঠিক ছিল। তরুণ সম্রাট-পুত্র, যিনি পরবর্তী কালে বাহরাম গোর নামে খ্যাত হয়েছিলেন, হীরা নগরীতে শিক্ষালাভের যে সুযোগ পেয়েছিলেন সে জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অঙ্কিত চিত্রে দেখা গেছে, তিনি বেদুঈন পোশাকে উটের পিঠে চড়ে বসে আছেন। যা হোক, পরবর্তী কালে হীরা নগরী বৈশিষ্টমন্ডিত এক আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়, যা আরব ও পারসিকদের ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ নির্যাস যুগপৎ ভাবে গ্রহণ করে এবং এভাবে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। বলা বাহুল্য, এ সংস্কৃতি ছিল সমসাময়িক অন্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এবং উন্নত।

মুসলিমদের হাতে ইরাক বিজয়ের পর হযরত উমর রা., যিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য সুখ্যাত ছিলেন, সেখানে সামরিক ছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার সামরিক কৌশলগত স্থানগুলোর মধ্যে হীরা নগরীকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মুসলিমদেরকে ঐ প্রাচীন নগরীতে বসতিস্থাপন না করার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেন, তারা যেন তার পাশে নতুন নগরের পত্তন করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নতুন নগরী - 'কুফা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ নগরীটি শুধুমাত্র মুসলিমদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত ছিল; সেখানে অন্য কারো বসতি স্থাপনের সুযোগ ছিল না। এখানে বসতি স্থাপনের জন্য প্রধানত ইয়েমেনের বাসিন্দাদের প্রেরণ করা হয়। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় আটান্ন জন সাহাবী ছিলেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ স. এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট কথা, ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত একটি জনগোষ্ঠি কুফা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন, যাদের মাধ্যমে সেখানে এক নয়া বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য জন্ম ও বিকাশ লাভ করে।

যখন হাজার হাজার মুসলমান বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুফায় আগমন করলেন, স্বাভাবিক কারণেই তখন তারা সেখানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সে অনুযায়ী হযরত উমর রা. বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রা. সেখানকার জনসাধারণকে সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে বসে শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় মসজিদটি ছিল তখন স্থানীয় গভর্নরের বাসভবনের অন্যতম অংশ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রা. যে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছিল তাতে লেখা ছিল ঃ হে কুফাবাসী, আমি আপনাদেরকে আমার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। আত্ম স্বার্থ ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ আমি এ লোকটিকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি যাকে আমার নিজের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রা. আপনাদের কাছে আমি শিক্ষক হিসাবে পাঠাচ্ছি। তিনি রসূলুল্লাহ স. এর সবচেয়ে সম্মানিত সাহাবী। অতএব এ সুযোগ আপনারা যেন নষ্ট না করেন।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন আইন শাস্ত্রের এক সহজাত প্রতিভা। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রধানত আইনের মূলনীতি তত্ত্বের বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তিনি বিশেষ ভাবে তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তির

অধিকারী ছিলেন এবং পাশাপাশি জটিল যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন। যা হোক, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম শিষ্য হযরত আলকামা আন-নাখায়ী তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলকামা আন নাখায়ীর পর তাঁর ছাত্র ইবরাহিম, অতপর তাঁর ছাত্র হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান (রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এঁদের মধ্যে হযরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান ছিলেন অনারব। তাঁর পর আবির্ভাব ঘটে হযরত আবু হানিফা রহ..এর। তিনিও ছিলেন একজন অনারব। অর্থাৎ তিনি ছিলেন এ পন্ডিতবর্গের ক্রমধারায় চতুর্থ অধস্তন প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হানিফা রহ.জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হিজরী ৮০ সনে এবং তাঁর জীবনাবসান ঘটে হিজরী ১৫০ সনে। ইতোমধ্যে ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া বংশের শাসন অবসানের পর আব্বাসিয়গণ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় আরোহন করেন। ফলে হযরত আবু হানিফা উমাইয়াদের শাসনের সমাপ্তি পর্যায় প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি আব্বাসিয় শাসকদের শাসনকালের প্রাথমিক কাল দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। যা হোক, আবু হানিফা রহ. এর নাম আবারো উচ্চারণ করতে হচ্ছে এ জন্য যে, 'কিতাবুর রায়' (সুচিন্তিত মতামতের সংকলন গ্রন্থ) নামে তাঁর একটি লিখিত গ্রন্থ রয়েছে। আপনারা জানেন, যে সমস্ত ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের সাহায্য অবলম্বন করতে হয়। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. এর উক্তিটি লক্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন, ('আমি আমার ব্যক্তিগত বিচারবোধের প্রয়োগ ঘটাবো।') অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন কিতাবুর রায় অর্থাৎ সুচিন্তিত মতামতের সংকলন। প্রশ্ন হচ্ছে কোন (মাসআলা) বিষয়ে কেউ কিভাবে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন? দুর্ভাগ্যক্রমে ইমাম আবু হানিফার রহ. এই বইটি আমাদের হাতে নেই। খুব সম্ভব হালাকু খানের বাহিনীর হাতে বাগদাদ নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সময় আরো বহু হাজার গ্রন্থের সঙ্গে তাইগ্রিস নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে বইটি হারিয়ে গিয়েছে। বইটি যদিও আমাদের কাছে নেই তবে আমরা এর পেছনে যে কারণটির কথা বললাম সে ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, এটিই ছিল আইনের মূলনীতি তত্ত্ব বিষয়ে লিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থ যার কথা আমাদের ঐতিহাসিকগণ বলে গেছেন।

### ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অবদান

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায় যে, বর্ণিত গ্রন্থটি আইনের সকল মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়ত করেনি। তবে আইন পরিবর্তনের জন্য কিভাবে যুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হয়, কিভাবে এর অর্থ/উদ্দেশ্য বুঝতে হয় এবং এগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় এই গ্রন্থ অবশ্যই সে সব বিষয়ে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছে। এটি ছিল এ বিষয়ে লিখিত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রথম গ্রন্থ। হয়ত তাঁর পূর্বেও আরো অনেকে আইন বিষয়ে লিখেছেন এবং তাদের নিজস্ব মতামতের (রায়) উপর ভিত্তি করে তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তবে আইনের পেছনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে তাদের কেউ কিছু লিখেননি। অন্তত এ ধরনের লিখিত গ্রন্থের কথা আমাদের জানা নেই। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর 'কিতাবুর রায়'ই হচ্ছে এ বিষয়ে লিখিত প্রথম গ্রন্থ। সত্যি বলতে কি তিনি এর মাধ্যমে আইন শাস্ত্রের প্রতি এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

বর্ণিত গ্রন্থের পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রহ. আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কেও অন্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক আইন আইনের এমন একটি শাখা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে প্রকৃত পক্ষে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। মুসলিমদের ভাগ্যে এ দায়িত্ব এসে জড়িয়ে যায় এমন ভাবে যে, মুসলিমগণ এ বিষয়ে এমন আইন তৈরি করেন যা পৃথিবী ব্যাপী সকল জাতি ব্যবহার করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ বিষয়ে 'কিতাবুস সিয়ার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মাঝে এ বিষয়ে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁদের মাঝে স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা এবং নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন সম্পর্কে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করেন।[৫]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ যে কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে তাদের মত তুলে ধরেছেন। তারা জোরালো যুক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যথাযথ বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর যে কোন মতামত (Proposition) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ কেউ এ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক আচরণ করেননি।

এ সবকিছু সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, হানাফী মূলনীতি তত্ত্বের আওতায় মাত্র পনের ভাগ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিজের মত বা সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাকি ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর দুই উত্তরসূরী ও ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী রহ.[৬] এর সিদ্ধান্ত ই দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত যে সব ক্ষেত্রে এ দুজন ছাত্র একমত হয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহ. এর অনুসারীগণ তাঁর মতের পরিবর্তে তাঁর দু ছাত্রের মতের উপরই আমল করেছেন।[৭]

তিনি তাঁর ছাত্রদের মাঝে যে দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করেছিলেন এটি আসলে তারই ফল। প্রকৃত পক্ষে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বরং নিজের মত করে চিন্তা করার জন্য তিনিই তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের ভেতর স্বাধীন চিন্তাধারা লালন এবং সত্য ছাড়া অন্য সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস সৃষ্টি করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. 'কিতাবুল উসূল' (মূলনীতির গ্রন্থ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মনে করা হয় যে, এ গ্রন্থটি আইনের মূলনীতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিল কিংবা হয়ত এটি ইমাম আবু হানিফার রহ. কিতাবুর রায় গ্রন্থেরই ছিল ভাষ্য। ইমাম আবু হানিফা রহ. গ্রন্থটি রচনা করার পর নিশ্চয় তিনি এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেছিলেন। এ নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনা অবশ্যই পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর লিখিত 'কিতাবুল উসূল' গ্রন্থে এ সব আলোচনা ও বিতর্কের প্রতিফলন ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ গ্রন্থটিরও অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দ্বিতীয় বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানীও একই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তাঁর কিতাবুল উসূল গ্রন্থ থেকে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থটির কথা বলছি সেটি একজন মু'তাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির লিখিত, যার নাম আবুল হুসাইন আল বাসরি। গ্রন্থটির নাম 'আল মু'তামাদ ফি উসূলিল ফিক্হ।' বস্তুত মু'তাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের লিখিত খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থের অস্তিত্বই বর্তমানে

দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য উল্লিখিত মু'তামাদ নামের গ্রন্থটির চারটি কি পাঁচটি হস্তলিপি এখনও টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে দুটি ইসতাম্বুলে সংরক্ষিত রয়েছে। ইয়েমেনি একটি সংস্করণ রয়েছে যার ফটোকপি রয়েছে মিসরে এবং অন্য আরেকটি পান্ডুলিপি রয়েছে আমার নিজের কাছে যেটি ইয়েমেনের এক কাজি সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন। একটি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি রয়েছে ইতালির মিলান নগরীতে। এ সবগুলো সংস্করণের সহায়তা নিয়ে একটি গ্রন্থ সম্প্রতি ছাপানো হয়েছে। একে মু'তাজিলি সম্প্রদায়ের আইন তত্ত্বের মূলনীতির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমি এ গ্রন্থটির একটি লাইনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেখানে বলা হয়েছে- 'আইনের মূলনীতি হচ্ছে চারটি - পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস।' বস্তুত এ গ্রন্থটি ইমাম মুহাম্মদ রহ. রচিত গ্রন্থেরই সার-সংক্ষেপ, যেখানে আবুল হুসাইন আল বাসরি ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যা হোক, এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মূল গ্রন্থ 'কিতাবুর রায়' এর ভাষ্য হিসাবে তাঁর একজন নয় বরং বহু সংখ্যক ছাত্র উসূলে ফিকহ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আরো একটি কারণ রয়েছে, যে জন্য আমরা এ মত প্রকাশ করছি। আমরা একটু আগে বলেছিলাম 'কিতাবুস সিয়ার' গ্রন্থটিও ইমাম আবু হানিফা রহ. লিখেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তথাপি এর মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতাংশ ছাড়া গ্রন্থটির অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই। তাঁর ছাত্রদের দ্বারা আন্তর্জাতিক আইনের উপর একই নামে (কিতাবুস সিয়ার) কমপক্ষে তিন থেকে চারটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইবরাহিম ইবনে ফাজারি ছিলেন অন্যতম। তাঁর লিখিত কিতাবুস সিয়ার গ্রন্থটি হস্তলিপি আকারে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। ইমাম মুহম্মাদ রহ. রচিত এ বিষয়ক দুটি গ্রন্থ রয়েছে- কিতাব আস সিয়ারুস সাগীর ও কিতাব আস সিয়ারুল কাবীর। এ দুটি গ্রন্থও আমাদের কাছে রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আরেক ছাত্র ইমাম জুফারও কিতাবুস সিয়ার নামে একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সমসাময়িক ইমাম মালিক ও ইমাম আওযায়ীও রহ. একই নামে অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে তাঁর সমসাময়িক অপর ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্ ওয়াকিদিও একই নামে একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বস্তুত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাবুস সিয়ার' ও তাঁর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর বহু সংখ্যক ছাত্র একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খুব সম্ভব ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অপর গ্রন্থ 'কিতাবুর রায়' এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং তাঁর ছাত্রদের ভেতর কেউ কেউ এ বিষয়ে একই নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হয়ত এ বিষয়টির জন্য 'মূলনীতি' বা 'উসূল' শব্দটি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফাই রহ.ব্যবহার করেছিলেন।

## ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অবদান

আইনের মৌলনীতি বিষয় নিয়ে লিখিত প্রথম তিনটি গ্রন্থ অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাবুর রায় এবং সাহিবাইনের কিতাবুল উসূল আমাদের হাতে আসেনি। কিন্তু আমাদের হাতে এ বিষয়ে লিখিত প্রাচীনতম যে গ্রন্থটি এসেছে সেটি ইমাম মুহাম্মদ আল হাসান আশ শায়বানী রহ. এর অন্যতম ছাত্র ইমাম শাফিয়ী রহ. এর লিখিত। পাশাপাশি ইমাম শাফিয়ী রহ. বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনার সাথেও

সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বছর ইমাম আবু হানিফা রহ. ইন্তেকাল করেন। কাজেই তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। তবে তিনি তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ আল হাসান আশ শায়বানী রহ. এর কাছে বহু বছর ব্যাপী শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। অনুরূপ ভাবে তিনি বহু বছরব্যাপী মদীনায় ইমাম মালিক রহ. এর কাছেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং অস্তি-নাস্তির বিরোধ ভিত্তিক দ্বান্দ্বিকতাবাদে (Dialectics) ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সে সময় মু'তাজিলা সম্প্রদায় তার খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করছিল। ইমাম শাফিয়ী রহ. তাদের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠানও করেন। বস্তুত বহুমুখী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মাঝে। পরিণতিতে তিনি ইসলামের প্রতি বিশেষ লক্ষণীয় অবদান রাখতে সক্ষম ছিলেন। এসব গুণের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো সে সময় মুসলিম জাতির ভেতর পরস্পর বিবদমান যে দল-উপদলের অস্তিত্ব ছিল তিনি সেগুলোর মাঝে ঐক্য ও মিলনের দূত হিসাবে কাজ করেছিলেন।

সে সময়ও, যেমন বর্তমানেও দেখা যায়, মুসলমানদের কেউ কেউ ছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন আবার কেউ কেউ ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী দু রকম দৃষ্টিভঙ্গির লোক সকল সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। যা হোক, সে সময় কিছু লোক ছিলেন হাদীস সংগ্রহ ও হাদীস শিক্ষার কাজে ব্যস্ত আবার অন্য কেউ কেউ ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে আগ্রহী। কিছু আইনজ্ঞ ছিলেন যারা আইনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা যুক্তিবিদ্যা (ইলমে মানতিক) ও দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী আইনের প্রতি অবদান রাখার কাজে মগ্ন ছিলেন। এঁদের মনোযোগ হাদীস থেকে কিছুটা সরে গিয়েছিল। পরিণতিতে সে সময় অর্থাৎ ইমাম শাফিয়ী রহ. এর সমসাময়িক কালে হাদীসপন্থী ও যুক্তিপন্থীদের (আহলে রায়) মাঝে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। হাদীসপন্থী বলে তাদেরকে বুঝানো হয়, যারা রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস ও তাঁর নির্দেশনা সংগ্রহ করার কাজে মগ্ন ছিলেন। অন্যদিকে যুক্তিপন্থী বলে সে সব আইনজ্ঞকে বুঝানো হয়, যারা ইসলামী আইন সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তারা ইসলামী আইন যুক্তি (নিজের রায়) প্রয়োগ এবং কিয়াস এর সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন। এ দু পন্থীদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গতিপথে মানুষকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। কেননা যারা যুক্তিপন্থী ছিলেন হাদীস সম্পর্কে তাঁদের বুৎপত্তি হাদীস সংগ্রহকারীদের পর্যায়ে ছিল না। তারা মনে করতেন তাদের সব প্রশ্নের উত্তর হাদীস শাস্ত্রে নেই। ফলে তারা তাদের যুক্তি ও কিয়াসের সাহায্য অবলম্বন করেন। এভাবে তারা নতুন সিদ্ধান্ত (Rulings) উপস্থিত করেন। এমনও অনেক সময় দেখা গেছে, তারা যে সমস্যার জবাব খুঁজছেন তার উত্তর হয়ত কোন হাদীসেই নিহিত রয়েছে। (অথচ তারা হয়ত তার সমাধানও নিজেদের রায় অনুযায়ী করেছেন।) ফলে আহলে হাদীস বলে পরিচিতগণ তাদেরকে খারেজী বা নব্যতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করতেন। তাঁরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস অগ্রাহ্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন, যদিও যুক্তিপন্থীগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে এ ধরনের কোন কাজ করেননি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে তারা সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কেই অনবহিত ছিলেন।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর ব্যক্তিত্বে উপরোক্ত দু ধরনের বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি একদিকে যেমন হাদীস শাস্ত্রের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তেমনি তিনি যুক্তির প্রয়োগ বা কিয়াসের (Analogy) নেতৃস্থানীয় শিক্ষকগণের কাছ থেকে শিখেছেন আইনশাস্ত্র । এ ছাড়া দর্শন ও দ্বান্দ্বিকতাবাদেও তাঁর ছিল পূর্ণ দখল। এভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন এক পান্ডিত্যের বিকাশ ঘটেছিল যার বলে তিনি উপরোক্ত দু ধরনের জ্ঞানের শাখার মাঝে সংযোগ গড়ে তুলেন এবং তিনি এ দুই মতাদর্শের নির্যাস (Synthesis) সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। বস্তুত তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জনই হল দ্বন্দ্বমুখর এ দুটি মতাদর্শের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করা। তিনি হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত এবং সচেতন ছিলেন এর পাশাপাশি কিয়াস, যুক্তি বা ব্যক্তিগত রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আরোহন (Deduction) এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও ছিলেন শীর্ষস্থানীয় একজন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি। ফলে তিনি উভয় শাখার অনুসারীদেরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম ছিলেন।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর আরেকটি অর্জন হচ্ছে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাবুর রিসালা'। এটি তিনি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। আমরা বলতে পারি বর্তমানে এটিই ইসলামী আইনের মূলনীতি বিষয়ে লিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থ যা আমাদের হাতে রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনুদিতও হয়েছে। উরদুতেও এটি অনুদিত হয়েছে। বলা যায় এটি লেখার মধ্য দিয়ে ইমাম শাফিয়ী রহ. এক নতুন বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেন। অন্তত এ কথা বলা যায় যে, তিনি এর মাধ্যমে আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের জন্য এক মজবুত ভিত্তি তৈরি করেন। যে বক্তব্য তিনি সেখানে রেখে গেছেন বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরও সেগুলোর আবেদন বা প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। তিনি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেগুলো এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে।

রিসালা শব্দের অর্থ হচ্ছে চিঠি। উপরোক্ত গ্রন্থের শিরোনাম হিসাবে এ শব্দটি ব্যবহারের নেপথ্য কারণ হচ্ছে, তাঁর এক ছাত্র তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন তাকে ইসলামী আইনের মূলনীতি তত্ত্ব বিষয়ে লিখিত আকারে কিছু পাঠ দান করেন। তার উত্তরে তিনি দেড় শ পৃষ্ঠার এ চিঠিটি লিখেন। এ চিঠিটি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ভাবে দিয়েছে, যেমনঃ আইন কী? আইন কিভাবে তৈরি হয়? আইনের উৎস কী? বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাঝে ভিন্নতা বা পার্থক্য কিভাবে দূর করা যায়? নতুন আইন কিভাবে তৈরি হয়? পুরনো আইন কিভাবে রহিত করতে হয়? আইনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত বিবরণ ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? ইমাম শাফিয়ী রহ. এর 'কিতাবুর রিসালা' এ ধরনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। উপরন্তু এটি আইনের ক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দঃপ্রকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের কী ভূমিকা সেটিও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করেছে। পাশাপাশি এ রিসালায় ইমাম শাফিয়ী রহ. গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জীবন কালে মু'তাজিলা সম্প্রদায় তার প্রভাব ও কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছিল। তারা সকল হাদীসকে এক কথায় প্রকৃত বা যথার্থ (Authentic) হাদীস বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। বর্তমানে সাধারণ ভাবে এটি বিশ্বাস করা হয় যে, মু'তাজিলা সম্প্রদায় মূলত

হাদীসকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ ধারণা আসলে সত্য নয়। প্রকৃত পক্ষে তারা হাদীস প্রত্যাখ্যান করার মত অবস্থানে ছিল না। আমরা ইতোপূর্বে আবুল হুসাইন আল বাসরির একটি গ্রন্থের কথা বলেছিলাম। ঐ গ্রন্থটি যিনি লিখেছেন তিনি মু'তাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন। তিনি বস্তুত হাদীসের যথার্থতা (Authenticity) নিরূপণ সম্পর্কিত বিধান সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লিখেছেন। বাস্তবতা হল তিনি সেখানে এ বিষয়ে যে মৌল নীতিমালার কথা লিখেছেন একজন সুন্নী পাঠকের পক্ষে ঐ নীতিমালার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন হবে। তাহলে কিভাবে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোকজনকে হাদীস অস্বীকারকারী বলে অভিযুক্ত করা যায়? এ বিষয়ে ইমাম শাফিয়ী রহ. যে অবদান রেখে গেছেন সে কথা আমরা এখানে স্মরণ করতে চাই।

মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের পন্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন, যে হাদীস কোন আইন বা বিধান সৃষ্টি করে অথবা যে হাদীসের ভিত্তিতে আইন উদ্ভাবিত হয় সে ধরনের হাদীসের জন্য একের অধিক বর্ণনাকারী থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন মাত্র বর্ণনাকারীর উপর নির্ভর করা যাবে না এবং সেটি এ জন্য নয় যে, যিনি বর্ণনা করছেন তিনি ভুল বর্ণনা করছেন, বরং তা এ জন্য যে, আইনের দাবী অনুযায়ী কোন বিবরণ বা বর্ণনা সঠিক কিনা তা অন্তত দুজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যই কেবল নিশ্চিত করে। তবে তাদের এ যুক্তি অন্য মুসলিম আইনজ্ঞগণ প্রত্যাখ্যান করেন। হাদীসপন্থী আলেমগণ ও ইমাম শাফিয়ী রহ. মু'তাজিলাদের এ যুক্তির বিরুদ্ধে যথার্থ বাস্তবসম্মত জবাব দেন। এর ফলে একজন বর্ণনাকারীর হাদীসের (অর্থাৎ 'হাদীসে আহাদ' এর) নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের যে আপত্তি তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় এবং সাধারণ মুসলমানগণ এ ধরনের হাদীসকেও পূণরায় গ্রহণ করতে শুরু করেন। ইমাম শাফিয়ী রহ. রসূলুল্লাহ স. এর জীবন থেকে এ ধরনের বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন যেখানে দেখা গেছে একজন মাত্র ব্যক্তির কথায় কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যেমন এক হাদীসে দেখা যায়, একদিন ফজরের নামাযের পর রসূলুল্লাহ স. একজন লোককে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যেন তিনি লোকজনের কাছে গিয়ে এ মর্মে ঘোষণা করেন, মুসলমানদের কিবলা জেরুজালেমের বদলে কাবার দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একজন মাত্র ব্যক্তিকে এ ঘোষনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি লোকজনকে নামাযরত অবস্থায় দেখে বললেন তারা যেন জেরুজালেমের পরিবর্তে কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তার এ কথা শুনে লোকজন সে ভাবেই আমল করেন। এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়, স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. এর জীবদ্দশায় একজন মাত্র ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর আমল করা হয়েছিল। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ স. এর কোন নির্দেশ যতক্ষণ অন্তত দুজন বর্ণনাকারী বর্ণনা না করেছেন ততক্ষণ তাঁর নির্দেশ মান্য করা হয়নি- এমনটি কখনো হয়নি ।

ইমাম শাফিয়ী রহ. আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একদিন মদীনায় রসূলুল্লাহ স. এর মনোনীত একজন সাহাবী একা মদ নিষিদ্ধের ঘোষনা দেয়ার জন্য অগ্রসর হন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস রাদি. এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর শৈশবে এ ঘটনা দেখেছিলেন। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হযরত আনাস রাদি. বলেন, যখন ঐ বার্তাবাহক সাহাবী তাঁর বাড়ির পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় মদপান নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষনা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি (হযরত আনাস রাদি.) তাঁর বাড়িতে আগত

অতিথিদেরকে মদ পরিবেশন করছিলেন। এ ঘোষনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা তাঁকে মদ নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি একটি হাতুড়ি হাতে নিয়ে মদের ব্যারেল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। যারা মদ পান করতে বসেছিলেন তারাও মদের পেয়ালা দূরে নিক্ষেপ করেন। এখানে লক্ষণীয়, এ সব কিছুই ঘটেছে একজন মাত্র ব্যক্তির ঘোষনার ভিত্তিতে।

বস্তুত ইমাম শাফিয়ী রহ. এ ধরনের বহু উদাহরণ উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন রসূলুল্লাহ স. এর কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য ঐ হাদীসটি একজন মাত্র ব্যক্তির বর্ণনা করাই যথেষ্ট। ইমাম শাফিয়ীর এটি ছিল এক বিরাট অর্জন যে, তিনি হাদীসপন্থী ও কিয়াসপন্থী উভয় দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন, যেন তারা উভয়েই ইসলামী আইন এর জন্য আরো ভালো অবদান রাখতে পারেন। ইমাম শাফিয়ী রহ.এর পূর্বে হাদীসপন্থীগণ শুধু হাদীসের বিষয়বস্তু চর্চা করা এবং সেগুলো অপরের কাছে বর্ণনা করা- এ দুটো কাজেই প্রবৃত্ত থাকতেন। তারা যুক্তিবিদ্যা, দর্শন বা দ্বান্দ্বিকতাবাদ ইত্যাদির মত বিষয়গুলো চর্চা করতেন না। ফলে দেখা গেছে, তারা কেবল হাদীসের শব্দগত অর্থের প্রয়োগের উপর জোর দিতেন, যা যথার্থ নয়। অন্যদিকে কিয়াস বা যুক্তিপন্থীগণ প্রাসঙ্গিক হাদীস যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান না করেই প্রাথমিক পর্যায়েই কিয়াসের সাহায্য অবলম্বন করতেন। পরিণতিতে হাদীস সম্পর্কে ঠিক মত না জেনে তাদের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে আইনগত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি ঘোষনা করতেন।

এ অবদান ইমাম শাফিয়ী রহ. এর। তার প্রভাবের গুণে হাদীসপন্থীগণ হাদীস বিষয়ে একটি নিয়ম অনুসরণ করতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। এ সময় একই বিষয়ের বিভিন্ন হাদীস অভিন্ন শিরোনামের অধীনে সংকলিত করা হয়, যেন পাঠক এগুলোর মধ্যে সময়-পরম্পরা (Chronology) সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে কোন্ হাদীসটি কোনটিকে রহিত করেছে তা সহজেই নির্ণয় করতে পারে। অন্যদিকে যুক্তিপন্থীগণ এবার হাদীস অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। এভাবে প্রধানত ইমাম শাফিয়ী রহ. এর উদ্যোগের ফলে ইসলামী আইন বিকাশ লাভের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়।

এখন পর্যন্ত মাত্র চারটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর 'কিতাবুর রায়', তাঁর দুই ছাত্রের দুটি গ্রন্থ 'কিতাবুল উসূল' এবং ইমাম শাফিয়ী রহ. এর 'কিতাবুর রিসালা'। এ গ্রন্থগুলো প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এগুলোর ভাষ্যগ্রন্থ ছাড়া এ বিষয়ে আর নতুন কিছু প্রকাশিত হয়নি। তুর্কীগণ এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ও বড় ধরনের অবদান রাখে। তারা এ বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে। তবে এগুলো ছিল পূর্বতন গ্রন্থগুলোরই হয় পুনরাবৃত্তি, নয়তো এগুলোর সংক্ষিপ্তসার কিংবা এগুলো সম্পর্কে তাদের নিজেদের মন্তব্য বা টীকার সমষ্টি। আবুল হুসাইন আল বাসরি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে দেড় হাজার পৃষ্ঠার দু খন্ডে বিভক্ত বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেটিকে ইমাম বায়জাবী রহ. বিশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থে রূপান্তরিত করেন। এরপর এটা একটা ধাঁধায় পরিণত হয়। শুরু হয় বায়জাবী রহ. এর এই গ্রন্থের উপর ধারাবাহিক নোট বা ভাষ্য লেখার কাজ। সে সময় তাঁর এ নাতিদীর্ঘ গ্রন্থটি পাঠ্য বই হিসাবে

পড়ানো হতো তবে এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হতো এর ভাষ্যগ্রন্থ ও নোটের যা লেখার কাজ তখন অব্যাহত ভাবে চলছিল।

### আধুনিক যুগ

আধুনিক কালে এ বিষয়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন স্যার আবদুর রহীম। এক সময় তিনি ছিলেন ভারতীয় আইনসভার (Indian Lagislative Assembly) প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীতে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। পাকিস্তান যাওয়ার পূর্বে তিনি যখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ছিলেন তখন একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কতগুলো বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতার সমষ্টি পরবর্তীতে Principles of Mohammadan Jurisprudence নামে প্রকাশিত হয়। তিনি এ বিষয়ে কিছুটা নবায়ন বা আধুনিকায়ন করেন। আইনের মূলনীতি তত্ত্বের উপর লিখিত পূর্বতন গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে যে আলোচনা রয়েছে তিনি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি দর্শন ও আইন বিষয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইসলামী ও ইউরোপীয় আইনের মূলনীতি তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করারও চেষ্টা করেন।

এ দিক থেকে দেখলে বলা যায়, স্যার আবদুর রহীম রচিত Principles of Mohammadan Jurisprudence আইনের মূলনীতি তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিত ক্লাসিক্যাল গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা আমরা তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু নতুন বিষয় দেখতে পাই যেগুলো পূর্বতন গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না। যেমন পুরনো গ্রন্থগুলোতে প্রথম যে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আইনের উৎস সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে পবিত্র কুরআন, হাদীস শরীফ, ইজমা এবং ব্যক্তিগত যুক্তি প্রদর্শন (বা কিয়াস)। এ সমস্ত গ্রন্থ ইবাদাত, পার্থিব বিষয় যেমন অপরাধ আইন, উত্তরাধিকার আইন, সাংবিধানিক আইন ও বাণিজ্য আইন ইত্যাদির মত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। মূলনীতি তত্ত্ব সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল গ্রন্থগুলো এ সব নিয়ে কাজ করে না। পক্ষান্তরে স্যার আবদুর রহীম তাঁর Principles of Mohammadan Jurisprudence -এ বর্তমান কালে আইনি বিষয় নিয়ে যেভাবে কাজ করা হয় সেভাবেই আইনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বস্তুত এটি তাঁরই অবদান যে, তিনি তাঁর ব্যাপকভিত্তিক কাজের মাধ্যমে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক শিক্ষাকে এক সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

### ইজতিহাদের অবস্থান

আলোচনার শেষ প্রান্তে আমরা ইজতিহাদের মত ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। রাসূলুল্লাহ স. হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে রাদি. যে সব বিষয়ে কুরআন ও হাদীস নীরব কেবল সে সব বিষয়ে নিজের যুক্তির প্রয়োগ ঘটানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। যদি কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে কোন নির্দেশনা দান করে তবে সেখানে ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। আবার যদি কোন বিষয়ে কুরআন শরীফ নীরব হলেও পবিত্র হাদীস স্পষ্ট নির্দেশনা দান করে তাহলে সেখানেও ইজতিহাদের প্রশ্ন উঠে না। এটি শুধু সেখানেই করা যায়

যেখানে আমাদের নির্ধারিত বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান দুটি উৎস অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই নিশ্চুপ রয়েছে।
এ ধরনের বিষয়ের জন্য আইন তৈরির যে প্রয়াস তাকে আমাদের আইনজ্ঞগণ নানা অভিধায় অভিহিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে ইজতিহাদ হলো একটি এবং কিয়াস হলো আরেকটি পরিভাষা। এ ছাড়া ইসতিদলাল হলো; এ রকম আরেকটি এবং ইসতিসলাহ্ হলো অন্য আরেকটি পরিভাষা। এ সমস্ত শব্দ পরস্পর সমার্থক নয়। এগুলোর অর্থের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি বিশেষ ভাবে ইসতিহ্সান শব্দটির কথা উল্লেখ করতে চাই। এ পরিভাষাটি হানাফী মাযহাবের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট যা আইনতত্ত্বের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কাজেই আপনারা এ কথা জেনে যেন অবাক না হন যে, ইমাম শাফিয়ী রহ. ইসতিহ্সান পরিভাষাটি প্রত্যাখ্যানের পক্ষে গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটির নাম 'আর রাদ আলাল ইসতিহ্সান'। এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে এ ধারণা হয় যে, ইসতিহ্সান শব্দটির আগে থেকে একটি বিশেষ অর্থ ধরে নেয়া হয়েছে যা শাফিয়ী রহ. গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন।
হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইসতিহ্সান শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ হচ্ছে এরূপঃ কোন বিষয়ের কেবল বাহ্যিক দিক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করলে তা ঐ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য যথেষ্ট হয় না। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে ঐ বিষয়টির গভীরে যেতে হয়। এটিই হচ্ছে ইসতিহ্সান। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মনে করুন, আমরা কোন এক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে কোন কিছু তার কাছে অর্পণ করলাম এবং তাকে ঐ বস্তুটি অন্য কোন একজনের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য বললাম। এ রকম ক্ষেত্রে যে কেউ আশা করবে যে, এই ব্যক্তি হুবহু ঐ বস্তুটি তার নির্দেশিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দিবে। যেমন বর্তমানে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার পাঠানো হয়। আমরা মানি অর্ডার করতে পোস্ট অফিসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত বা জমা রাখি এবং আমরা পোস্ট অফিসকে অনুরোধ করি যেন ঐ টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়া হয়। এ ভাবে অর্থ গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতির দাবী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অভিন্ন সেই টাকাই নির্ধারিত ঠিকানায় পৌছে দিবে। কিন্তু পোস্টাল পদ্ধতি অনুযায়ী এই জমা দেয়া টাকা ট্রেজারিতে জমা দিয়ে দেয়া হয় এবং প্রাপককে কেবল ঐ টাকার সমপরিমাণ টাকার অন্য নোট সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে এটা জরুরী নয় যে, প্রেরক যে নোটগুলো মানি অর্ডার করেছেন হুবহু সে নোটেই ঐ অর্থ প্রাপককে সরবরাহ করতে হবে। এটিই ইসতিহ্সান পরিভাষাটির প্রকৃত অর্থ। যদিও গচ্ছিত অর্থ বা আমানত হস্তান্তরের বর্তমান পদ্ধতি ভিন্নতর, তথাপি রূপক (Superficial) অর্থে, গচ্ছিত বা আমানত কথাটির যে তত্ত্বগত দিক, সেদিক থেকে দেখলে দেখা যায়, প্রেরক যে অর্থ হস্তান্তরের জন্য দিয়েছে তার মূল্যমান অপরিবর্তিত রেখে তা হস্তান্তরের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করা হচ্ছে- বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি এমন অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং এ কথা বলা যায়, এখানে আমানত কথাটির যে কনসেপ্ট (Concept) তার সার কথাটি নষ্ট হয়নি।
এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা যে, মুসলিম জাতি তার রসূল স. এর ইন্তেকালের পর তাদের আইনকে এমন ভাবে সংকলিত করে যে, এতে কেবল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য

একে সংরক্ষিতই করা হয়নি, পাশাপাশি এটি সর্বযুগের জন্য যেন অনুশীলনযোগ্যও হয় সেটিও নিশ্চিত করা হয়। এটি সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত নীতি যে, যে কোন আইনকে দু ভাবে পরিবর্তিত করা যেতে পারে- যিনি আইন সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজে পরিবর্তন করতে পারেন অথবা তারও উপরের কোন কর্তৃপক্ষ সেটি করতে পারেন। নিচের স্তরের কেউ আইন পরিবর্তন করতে পারেন না। যেমন, যদি সৃষ্টিকর্তা কোন নির্দেশ দেন তাহলে সে নির্দেশ কেবল তিনিই পরিবর্তন করতে পারেন। ঠিক একই ভাবে যদি কোন রায় বা বিধান আল্লাহর কোন রসূল দিয়ে থাকেন তবে তা তিনি অথবা অন্য কোন নবী বা রসূলই পরিবর্তন করতে পারেন। আর পরিবর্তন করতে পারেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কিন্তু আল্লাহর রসূল স. কর্তৃক জারিকৃত কোন বিধান তার চেয়ে নিম্নের স্তরের কেউ, যেমনঃ আদালতের বিচারক, বা কোনশাস্ত্রবিদ পরিবর্তন করতে পারেন না। তবে একজন বিচারকের মতামত বা রায় অন্য আরেকজন বিচারক গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে তার নিজের মত পেশ করতে পারেন।

এ নীতি কেবল ব্যক্তিগত মতামত বা অনুসিদ্ধান্ত (Inference)–এর ক্ষেত্রেই নয়, সামষ্টিক মতামতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়। অন্তত হানাফী মাযহাবের নীতি হচ্ছে, একটি প্রতিষ্ঠিত মতৈক্য (ইজমা বা Consensus) কেবল আরেকটি সর্ব-মতৈক্য দ্বারাই খন্ডন বা বাতিল হতে পারে। মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ ইজমার যে বিধিসম্মত কর্তৃত্ব (Authority) রয়েছে তা আমরা স্বীকার করি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, অনন্তকাল পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবে না। যদি প্রতিষ্ঠিত ইজমার প্রতি যথাযথ সম্মান ঠিক রেখে কেউ বর্তমান ইজমার বিপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করার সাহস দেখাতে পারেন এবং আইনজ্ঞগণকে বুঝিয়ে যদি তার মতের পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন, তবে তার মতের অনুকূলে নতুন ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নতুন প্রতিষ্ঠিত ইজমা পূর্বতন ইজমার কার্যকারিতা রহিত করে দিবে। এ মৌলনীতিটি প্রসিদ্ধ হানাফী আইন বিশারদ আবুল য়ুস্‌র্ আল বাজদাবী রহ. তাঁর 'উসূলুল ফিক্‌হ' (আইনের মূলনীতি শাস্ত্র বা Principle of Jurisprudence) গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। আল বাজদাবী রহ. এর জীবনকাল ছিল চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীতে বিস্তৃত। তাঁর এ গ্রন্থ ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ছিল এক বিরাট অবদান। এ নীতিটি এসেছে তাঁরই এক বক্তব্যের ভিত্তিতে। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বলতে পারি, কোন ইজমা আমাদের জন্য জটিলতার কারণ হতে পারে না। যদি কোন বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কালে তার উপযুক্ততা অবশিষ্ট না থাকে, তবে এটা অসম্ভব নয় যে, আমরা কিয়াসের মাধ্যমে এটি পরিবর্তন করবো এবং পূর্বতন ইজমাকে রহিত করে দিয়ে নতুন একটি ইজমা প্রতিষ্ঠিত করবো।'

**প্রশ্ন ঃ ইজতিহাদ, ইজমা এবং কিয়াসের ধরন বা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?**

**উত্তর ঃ** এটি কোন নির্দিষ্ট একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি আসলে সারা মুসলিম বিশ্বের সমস্যা। আমরা যদি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, যে বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের উদ্যোগে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামষ্টিক ভাবে ঐ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। আমরা যদি ঐ বিষয়ে নিজেরা ঐকমত্য বা ইজমা প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে ভালো। অন্যথায় সরকার জাতীয় আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের মতামতটিকে এ ক্ষেত্রে কার্যকর করবে।

প্রশ্নে ইজমা ও কিয়াস এ দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এখানে বিষয় একটিই- ইজতিহাদ। সামান্য কিছু পার্থক্য থাকার কারণে একে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। ইজতিহাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ কিয়াস এবং ইসতিহসান- সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। সংক্ষেপে বলা যায়, কিয়াস ও ইজমা এক অর্থে একই বিষয়। তবে আরেক দিক থেকে দেখলে এখানে পার্থক্য হচ্ছে, ইজতিহাদ হলো একজন ব্যক্তির মতামত। অন্য দিকে সকল আইনজ্ঞ ও আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকলের মতের ভিত্তিতে তাদের ভেতর প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্যকে বলা হয় কিয়াস।[৮]

আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, কিয়াসের ধারণাটি মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গত চৌদ্দ শ বছরে আমরা একে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ব্যাপারে সামান্যই দৃষ্টি দিয়েছি। ফলে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য আমাদের এখন কোন উপায় নেই। মুসলিমগণ একেবারে শুরু থেকেই তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল- এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সকল আইনজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করা কখনো সম্ভব হয়নি; সম্ভবত সে সময় সবখানে যোগাযোগ করা কঠিন ছিল বলে। কিন্তু বর্তমানে এটি অসম্ভব কিছু নয়। এ কারণেই আমরা শুরুতেই বলেছি এটা কোন নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা মনে করা উচিত নয়। মুসলিমগণ যেখানেই আছে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত। যেমন, প্রতিটি দেশে ইসলামী আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ সব সমিতির প্রধান কার্যালয় যে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এটি হবে একান্ত ই মুসলিমদের সংগঠন। এ সংগঠনের সচিবালয় সদস্য দেশগুলো থেকে রেফারেন্স সংগ্রহ করবে। এ প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে কোন বিষয়ে পৃথিবীর মুসলিম আইনজ্ঞদের মতামত দরকার বা তাদের মতামত প্রকাশ করা উচিত তবে সচিবালয় মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোর শাখাগুলোর কাছে প্রশ্নটি পাঠাবে। প্রতিটি শাখা স্ব স্ব এলাকার সকল মুসলিম আইনজ্ঞের কাছে ঐ প্রশ্নটির কপি পাঠাবে। প্রশ্নটির একটি যৌক্তিক উত্তর প্রদানের জন্য তাদের কাছে অনুরোধ করবে। শাখা অফিস প্রশ্নটির উত্তর পাওয়ার পর সেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে কিংবা দেয়া হয়নি সে ব্যাখ্যাসহ উত্তরগুলো প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিবে। কোন আইনজ্ঞের ভিন্নমত পেলে তার বা তাদের যুক্তির বিস্তারিত বিবরণসহ নোট দিয়ে দিতে হবে।

এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ভাষা হবে আরবী। তবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি সদস্য দেশ তার নিজের ভাষা ব্যবহার করতে পারে। যেমন, যদি কোন প্রশ্ন বাংলাদেশে পাঠানো হয়, তবে তার উত্তরে এ দেশের আইনজ্ঞগণ বাংলা ভাষা বা অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সেটি যখন প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে তখন তা হবে আরবী ভাষায় লিখিত; যেন মুসলিম বিশ্বের সকল আইনজ্ঞ এটি বুঝতে পারেন এবং এর দ্বারা উপকৃত হন। আমাদের মতে, একজন ভাল ইসলামী আইনজ্ঞের আরবী ভাষার উপর যথেষ্ট দক্ষতা থাকা উচিত।

এভাবে সকল শাখা থেকে উত্তর পাওয়ার পর যদি বিষয়টির উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা যথাযথ ভাবে ঘোষণা করতে হবে। অন্যদিকে যদি ঐকমত্য না হয়ে কারো কোন ভিন্নমত

থাকে, তবে তাদের সকলের মতামতের একটি সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করে তা সকল আইনজ্ঞের কাছে পাঠাতে হবে। এর ফলে তারা সকলে সকলের মতামতের যৌক্তিক পয়েন্টগুলো বুঝতে পারবেন। আবার যিনি বা যারা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন তারাও হয়ত একে (অর্থাৎ যৌক্তিক মতামতগুলো) দেখে তাদের মত পরিবর্তনের পক্ষে একে উপযুক্ত যুক্তি বলে বিবেচনা করবেন। এভাবে যখন দ্বিতীয়বারের মত সকলের জবাবগুলো প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌছুবে, তখন যে সব বিষয়ে ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব বিষয়কে যে কেউ চূড়ান্ত ভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন। একই ভাবে যে সব বিষয়ে ভিন্নমত এখনও রয়ে গেছে, সে সব বিষয়ও তিনি চিহ্নিত করতে পারবেন। তখন যে সব বিষয়ে মতানৈক্য রয়ে গেছে সে সব বিষয়ে অধিকাংশের মতামত কী সেটিও আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারব। এ সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট একটি ভল্যুমে প্রকাশ করতে হবে, যেন এতে আইনজ্ঞগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল জবাব এবং প্রতিটি মতের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত থাকে।

এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া ইজমা-কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং বর্তমান যুগে এর দ্বারা উপকৃত হবার তত্ত্ব (Concept)। কেননা সারা পৃথিবীর সকল অভিজ্ঞ ইসলামী আইনজ্ঞকে একস্থানে সমবেত করা ও তাঁদেরকে স্থায়ী ভাবে একস্থানে সমবেত রাখা একেবারেই অসম্ভব। তাঁদেরকে হয়ত কোন সম্মেলনে কয়েকদিনের জন্য সমবেত করা সম্ভব, কিন্তু সারা জীবনের জন্য এটা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা যদি উপরোক্ত ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারি, তবে ইসলামী আইনজ্ঞগণ তাঁদের মতামতের দ্বারা, যে মতামত এভাবে সারা পৃথিবীতে পৌছে দেয়া সম্ভব, আমাদেরকে সহজেই উপকৃত করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** ইসলামী আইনে মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, অভ্যন্তরীণ অভিপ্রায় অনুযায়ী নয়। এটি কেন করা হয়?

**উত্তর :** অতি সহজ একটি কারণে, সেটি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের অভিপ্রায় পর্যবেক্ষণ করার কোন উপায় নেই। এমনও হতে পারে, কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন এক ব্যক্তির কোন কাজের পেছনে বিশেষ একটি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু যখন তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তখন সে ঐ অভিপ্রায়ের কথা অস্বীকার করলো। এ রকম ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে বাহ্যিক আচরণের ভিত্তিতে কাজ করতে বলেছেন। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনের অভিপ্রায় কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ বিষয়ে সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা বলা যায়, যেখানে সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা রাদি. কোন এক যুদ্ধে একজন শত্রুকে হত্যা করেছিলেন, অথচ ঐ ব্যক্তি শেষ মুহূর্তে উচ্চ কণ্ঠে ইসলামে তার বিশ্বাসের কথা ঘোষনা করেছিল। রসূলুল্লাহ স. এ ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং হযরত উসামা রাদি. এর কাছে এর ব্যাখ্যা চান। হযরত উসামা রাদি. তখন বলেন, লোকটি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে এ ধরনের কৌশল নিয়েছিল। (অর্থাৎ সে জীবন বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল; অন্তর থেকে বলেনি)। রসূলুল্লাহ স. তখন তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেন, 'তুমি তার বাস্তব অবস্থা বুঝার জন্য তার অন্তর চিরে তার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখনি কেন?' সুতরাং অন্য ভাবে বলা যায়,

মানুষের কাজ, আচরণ বা তার উচ্চারণ -যা পর্যবেক্ষণযোগ্য, কেবল তার উপর ভিত্তি করেই আমরা রায় দিতে পারি; এ ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই।

**প্রশ্ন ঃ** সকলেরই কি ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে এভাবে মানুষে মানুষে যে বিপুল সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত সৃষ্টি হতে পারে আমরা তার সমাধান বের করব কিভাবে?

**উত্তর ঃ** সকলের এ অধিকার নেই। যাদের ইসলামী আইন ও আইনের মূলনীতি শাস্ত্র সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে কেবল তাদের এ অধিকার রয়েছে।[১]

সত্যি বলতে কি, ভিন্ন মত সৃষ্টি হলে তাতে ক্ষতি নেই। আমাদের জানতে হবে অধিকাংশের মত কোন্‌টি আর বাকী অল্প সংখ্যক লোকের অভিমত কোন্‌টি। আমরা যখন অল্প সংখ্যকের মতামত জানব, কেবল তখনই আমরা ঐ মতামত গ্রহণ কিংবা বর্জন করার সুযোগ পাব। বস্তুত মতের ভিন্নতা একটি আশির্বাদ যদি তা চারিত্রিক শুদ্ধতা এবং সততার ভিত্তিতে করা হয়।

**প্রশ্ন ঃ** ইমাম শাফিয়ী রহ. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন মাত্র বর্ণনাকারীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যকে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামী আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন মাত্র বর্ণনাকারীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না। এ স্ববিরোধিতার (Contradiction) সমাধান কী?

**উত্তর ঃ** উত্তর হচ্ছে, একজন বিচারক যখন আইনের অধীনে কোন কিছুর বিচার করবেন, তখন তিনি এ বিষয়ে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য তলব করবেন। কিন্তু হাদীস সংগ্রহের বিষয়টি এ থেকে একান্তই ভিন্ন। আমরা যদি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কোন হাদীস জানতে পারি, তবে এ রকম হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী রহ. একে গ্রহণ করে নেয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু আদালতে যখন কোন মামলা করা হবে তখন সেখানে সাধারণ ভাবে দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীও সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেমন, একজন গৃহবধু যদি তার কোন সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তবে এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কেননা এ রকম ক্ষেত্রে অন্য মানুষ সাধারণত সেখানে উপস্থিত থাকে না। ব্যভিচারের বিচারের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন চারজন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা বেঁধে দিয়েছে। বস্তুত আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে, কোন হাদীস গ্রহণ করা আর আইনের অধীনে কোন বিষয়ের বিচার করা একেবারেই ভিন্ন বিষয়। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন নাযযাম। তিনি কোন হাদীসের বর্ণনাকারী কমপক্ষে দুজন না হলে সেটি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন রকম অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমরা বিপুল সংখ্যক হাদীস থেকে বঞ্চিত হবো। সে ক্ষেত্রে সেটি হবে বিশাল শিক্ষাগত ও ধর্মীয় ক্ষতি। সংক্ষেপে বলা যায়, কোন হাদীসের ক্ষেত্রে একজন মাত্র বর্ণনাকারী হলেও গ্রহণযোগ্য হবে, পক্ষান্তরে আইনের আওতায় কোন বিষয়ের বিচার করতে গেলে ন্যূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার বিধান অক্ষুন্ন থাকবে - এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন স্ববিরোধিতা নেই।

**প্রশ্ন ঃ** যিনি আইনদাতা তার অনুমোদন ছাড়া কিংবা তিনি যেভাবে অনুমোদন দিয়েছেন তার বিপরীত উপায়ে আইনকে পরিবর্তন করা যায় কি? আমি এ ক্ষেত্রে কাদিসিয়্যার যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি

অক্কাস রাদি. কর্তৃক আবু মিহজান আস্ সাকাফীকে, যিনি মদ্যপান করেছিলেন, ক্ষমা করে দেয়ার ঘটনার কথা বলছি। এ ছাড়া হযরত উমর রাদি. কর্তৃক একজন চোরের হাত কাটার বিধান মুলতবী করার ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত করছি।

**উত্তর ঃ** আমি প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে যা বলতে চাই সেটি হচ্ছে, বর্ণিত ঘটনাটি একেবারেই ব্যতিক্রমী এক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। ঐ রকম একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট আইনটি হয়ত কার্যকর করা হয়নি কিংবা এর বাস্তবায়ন সাময়িক ভাবে মুলতবী রাখা হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে এ রকম, কাদিসিয়্যার যুদ্ধে উল্লিখিত আবু মিহজান আস্ সাকাফী মদ্যপান করে মাতাল হলে তাকে মদ পানের শাস্তি স্বরূপ চাবুক মারার পরিবর্তে সাময়িক ভাবে কারান্তরীণ করা হয়। পরে তাকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তির পর সে খুবই সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুকে প্রতিহত করে। এটি ছিল মুসলিমদের পক্ষে এক বিরাট প্রাপ্তি। তার এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস রাদি. ক্ষমা করে দেন। অন্যদিকে সে নিজেও তখন গভীর ভাবে অনুতপ্ত। সে বলছিল, যদি তাকে চাবুক দিয়ে পেটানো হতো তাহলে আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দিতেন। এখন মানুষ তাকে ক্ষমা করলেও আল্লাহর কাছে তাকে তো এখনও জবাবদিহি করতেই হবে। যা হোক, পরে সে তওবা করে এবং আর মদ্যপান না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বস্তুত হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস রাদি. তাকে শাস্তিদানের পরিবর্তে ক্ষমা করে দিয়ে তার ভেতর সত্যিকারের অপরাধবোধ জাগ্রত করতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, হযরত উমর রাদি. চুরির অভিযোগের কারণে অভিযুক্তের হাত না কেটে তা স্থগিত করে দিয়েছিলেন, কারণ তখন দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। এই সিদ্ধান্তটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ফল। বস্তুত তাঁর নিস্বার্থতা ছিল প্রবাদপ্রতীম। তাঁর সম্পর্কে বলা হতো, 'উমর রাদি. কর্তব্য সম্পাদনের নামে কখনো তাঁর ব্যক্তিগত অহংবোধকে জাহির করেন না।' যা হোক, এখানে কেউ হয়ত যুক্তির দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যে সময়ে হযরত উমর রাদি. রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, যদি এই ব্যক্তিকে সে সময় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হতো, তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে সেও একই ধরনের পদক্ষেপ নিতো।

**প্রশ্ন ঃ** আপনি বলেছেন, যিনি আইন সৃষ্টিকারী তিনি অথবা তারও উপরের কর্তৃপক্ষই কেবল পারেন আইন পরিবর্তন করতে। কিন্তু হযরত উমর রাদি. কোন আইন সৃষ্টিকারীও ছিলেন না আবার তিনি নবীও ছিলেন না। অথচ তিনি চোরের হাত কাটার বিধান পরিবর্তন করেছিলেন। কিভাবে এবং কি জন্য তিনি এমন করেছিলেন?

**উত্তর ঃ** আমার ধারণা তিনি কুরআন শরীফের এ আয়াতের উপর নির্ভর করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে (২:১৭৩)ঃ '...কিন্তু তার কথা আলাদা যে প্রয়োজনের কারণে করেছে...।' এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োজন বা জরুরী পরিস্থিতির দাবী পূরণের তাগিদে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে যায়, যে জরুরী অবস্থার পক্ষে বা তার অনুকূলে প্রয়োগযোগ্য কোন আইনের কথা জানা নেই। হযরত উমর রাদি. দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্য দিয়ে বস্তুত এ ধরনেরই একটি জরুরী অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই

কারণে তিনি ছাড় দিয়েছিলেন। যদি হযরত উমর রাদি. এমন সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে প্রচুর লোক মারা পড়তো এবং তাদের মৃত্যুর জন্য হযরত উমরই দায়ী হতেন। একজন খোদাভীরু শাসক হয়ে এ ধরনের অবস্থা তিনি বরদাশত করতে পারতেন না।

**প্রশ্ন ঃ** ইজমা'র অর্থ কী? মুসলিম সম্প্রদায়ের সব লোকের ঐকমত্য না কি ঐ সম্প্রদায়ের উলামা সমাজের ঐকমত্যকে ইজমা বলা হবে? রসূলুল্লাহ স. এর যে হাদীস এ পদ্ধতির অনুমতি দিয়েছে সেটি মূলত পরোক্ষ ভাবে 'উম্মাহ'কেই বুঝিয়েছে। কিন্তু উম্মাহ অর্থাৎ একটি সম্প্রদায়ের (Community) মধ্যে ঐকমত্য কিভাবে সম্ভব? মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় কাদের ঐকমত্যকে পুরো সম্প্রদায়ের ঐকমত্য হিসাবে গণ্য করা হবে? উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইরাকের জনগণের না কি বাংলাদেশের জনগণের ঐকমত্যকে পুরো সম্প্রদায়ের ঐকমত্য বলা হবে?

**উত্তর ঃ** আমি ইতোপূর্বে বলেছি, মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐকমত্য আর ঐ সম্প্রদায়ের উলামাদের ঐকমত্য একই কথা। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐকমত্য কথার অর্থ এই নয় যে, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ও নিরক্ষরসহ সকলের মতামত নিতে হবে। এখানে ইজমা কথাটির অর্থ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উলামায়ে কিরামকে মতামত দিতে হবে। কেননা যদি জ্ঞানের কোন একটি শাখার প্রতি একজন লোকের কোন আগ্রহ বা ঝোঁক না থাকে, তাহলে জ্ঞানের ঐ শাখায় একজন এডভেঞ্চারারের মত তার অনুপ্রবেশ তার জন্যও কোন ফল বয়ে আনবে না, তেমনি তা জ্ঞানের ঐ শাখারও কোন কাজে আসবে না। অতএব এখানে যাদের ঐকমত্যের কথা বলা হচ্ছে তারা হচ্ছেন একমাত্র উলামা এবং আইনের মূলনীতি তত্ত্বে পারদর্শী বিজ্ঞ সমাজ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা যে মত প্রকাশ করবেন, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। এখানে এমন হতে পারে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন এক রকম মত প্রকাশ করলেন, আবার হয়ত ঐ একই বিষয়ে আরেকজন দ্বিমত করলেন। এভাবে তাদের মাঝে বিতর্ক হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে তাদের মধ্যে হয়ত এক ধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[১০]

**প্রশ্ন ঃ** ইরাকের জনগণ তুলনামূলক ভাবে হাদীসের অল্প অংশ পেয়েছে- এ কথা বলা কি ঠিক হবে? এবং এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা রহ. (হাদীসের পরিবর্তে) ব্যক্তিগত যুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ইসলামী আইনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।[১১]

এ মানসিকতা পারসিকদেরকে অভিভূত করে এবং সে জন্য সেখানে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

**উত্তর ঃ** আমি এ ধারণা মানতে রাজি নই। ইমাম আবু হানিফা রহ. আইনের মূলনীতি শাস্ত্র (উসূলুল ফিক্‌হ) বিকাশের একেবারে প্রাথমিক যুগের মানুষ ছিলেন। তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. এর জীবদ্দশায় হাদীস সংকলনের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল সেটি তখনও পর্যন্ত (অর্থাৎ ৮০ হিজরীতে) শেষ হতে পারেনি। বস্তুত এটি ছিল বিশেষজ্ঞদের কাজ। এ সময় কিছু লোক ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী। অন্যদিকে বাকীরা ছিলেন আইনের মূলনীতি তত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী। তখনও পর্যন্ত বুখারী ও মুসলিম শরীফের মত হাদীসের সংকলন-গ্রন্থ লিখিত হয়নি। যদি এ অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদীসের সন্ধানে আইনের মূলনীতি তত্ত্ব বিষয়টি ত্যাগ করতেন তাহলে তিনি জ্ঞানের এ শাখায় তাঁর সারা জীবন ব্যয় করতে পারতেন।

অন্যদিকে, ইরাকে হাদীস নিশ্চয় পৌছেছে। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু বিষয়ে হাদীসের সরাসরি নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাঁর মতামত দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে, দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল ব্যাপী, বিপুল সংখ্যক হাদীস আইনজ্ঞগণের (ফকিহ্‌গণের) হাতে এসে পৌছে। এ সময় হানাফী মাযহাবের অনুসারী আইনজ্ঞগণ বিভিন্ন বিষয়ে আবু হানিফা রহ. এর মতের বিপরীত মত প্রকাশ করেন এবং এভাবে তাঁরা হানাফী আইনের একটি অংশ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের পরিবর্তে তাঁর শিষ্যদের মতামতকেই অনুসরণ করেন। কিন্তু সেটিকেও হানাফী মাযহাবের অংশই মনে করা হয়। মূলত এটি ইতিহাসের বিষয় যে, ইতিহাসের একটি পর্যায় পর্যন্ত হাদীস সম্পর্কে আইনজ্ঞগণের জ্ঞান তুলনামূলক ভাবে কম ছিল। তবে তাঁরা কখনো হাদীস সেভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি। আমার মতে, এ কথা বলাও একেবারেই ভুল যে, পারসিক কিছু লোকের অদ্ভুত মানসিক পূর্বানুরাগ দ্বারা হাদীস সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়েছিল।

টীকা.

১. আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান ও ফিকহ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন এক বিষয় নয়। কবে একটি অপরটির সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূলত প্রথমটির প্রত্যক্ষ সহায়তায় দ্বিতীয়টির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

২. কুরআন ও হাদীসে শরীয়তের যে বিষয়ে মূলত সরাসরি বিধান উল্লিখিত নেই, ইসলামী আইনের এরূপ কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ এবং পাশাপাশি কখনো কখনো ইজমা' ও কিয়াসের এর উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালার সহায়তায় কোন সমাধান নিজের সৎ বিচার বোধের সর্বোত্তম ও সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে ইজতিহাদ বলা হয়। ইমামু আবু হানিফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমামগণ প্রধানত এ প্রক্রিয়ার সহায়তায় ফিকহ শাস্ত্র তথ্য ইসলামী আইন শাস্ত্রকে বিপুল ভাবে আইন শাস্ত্রকে বিপুল ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

৩. সৎ বাক্য বলতে কালিমা তায়্যিবাকে বুঝানো হয়েছে।

৪. একবার হযরত উমর রা. এর কাছে একজন মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামী তাকে নামায পড়তে দেন না, রোযা রাখতে দেন না ইত্যাদি। এ কথা শুনে হযরত উমর রা. স্বামীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তখন হযরত আলী রা. প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বুঝালেন, স্বামী কর্মস্থল থেকে গৃহে ফেরার পর স্ত্রীকে সর্বদা দেখেন নফল নামাযে নিমগ্ন। অন্য দিকে স্ত্রী বারবার নফল রোযা রাখার কারণে স্বামী জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না বলে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সে জন্য স্বামী চাইতেন স্ত্রী এভাবে নফল নামায ও রোযা যেন না রাখেন। এ কথা জানার পর হযরত উমর রা. তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তখন তিনি উপরোক্ত উক্তিটি করেন।

৫. এখানে সম্ভবত লেখক বুঝাতে চেয়েছেন ইসলামের চার মূলনীতির আওতায় স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান, স্বাধীন চিন্তাধারা এবং যুক্তির প্রয়োগ ঘটানোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন। কেননা আবু হানিফা রহ. ইজতিহাদের সময় কখনো ইসলামের চার মূলনীতির গন্ডির বাইরে যাননি। তিনি মূলত যে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন শরীফে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল আয়াত, হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কিরামের আচরণ ও আমল ইত্যাদি সামনে রেখে এবং আয়াত ও

হাদীসসমূহের প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে অতপর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হাদীসের শাব্দিক অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে হাদীস দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কী বুঝানো হয়েছে সে দিকে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৬. এ দুজনকে একসঙ্গে বলা হয় সাহিবাইন।

৭. সাধারণত হানাফী ফিকহের কিতাবে দেখা যায়, যে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে প্রথমত ইমাম আবু হানিফার রহ. সিদ্ধান্ত আলোচনা করে তারপর সাহিবাইনের মত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মতের উপরই আমল করা হয়। অতএব হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানিফার রহ. এর সিদ্ধান্ত মাত্র ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় বা সাহিবাইনের মতের উপরই আমল করা হয় -এ কথাটি পরিষ্কার নয়।

৮. এ ধরনের ঐকমত্যকে ইজমা বলা হয়। কিয়াসও একজন ব্যক্তির মত হতে পারে। তবে তাতে সমসাময়িক সকল বা অধিকাংশ আইনজ্ঞ একমত হলে তখন তা ইজমা-য় পরিণত হয়।

৯. ইসলামী আইন, ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্র এবং এগুলোর পাশাপাশি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যাদের প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আরবী ভাষার উপর যাদের উপযুক্ত দখল রয়েছে কেবল তারাই পারেন ইজতিহাদ করতে।

১০. ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের সে ঐকমত্য বা ইজমা অনুযায়ী আমল করা মুসলিমদের জন্য জরুরী হবে। তার পূর্বে যখন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করতে থাকবেন, সে রকম পরিবর্তনশীল সময়েও (Transitional period) তাদের মতামতের উপর মুসলিমগণ আমল করতে পারেন।

১১. ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়। তিনি বরং বহু হাদীস সরাসরি সাহাবীগণের কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আইনের মূলনীতি শাস্ত্র বিষয়ে যেমন কাজ করেছেন তেমনি ইসলামী আইন বিষয়েও কাজ করেছেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকেই তাঁর কর্মকান্ড পরিচালিত করেছেন। এর জন্য দেখুনঃ দারসে তিরমিযি, মাওলানা মুফতি তাকী উসমানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০-৯৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউপি, ভারত, প্রকাশকাল: মে ১৯৯৮

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা : ৩৩-৫৮

# বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা : সমস্যা ও উত্তরণ চিন্তা

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী আংইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় মুসলিম স্পেনও বর্তমান পর্তুগালসহ দীর্ঘ আট শত বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) ইসলামী আইন কার্যকর ছিল। বিগত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ইসলামী আইন বলবৎ রাখে। অতঃপর তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রণয়নের পর ধীরে ধীরে প্রতিটি বিভাগ থেকে ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। তবে আইন প্রণয়নে তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের সহায়তা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, তারা ইসলামী আইনকে নিজেদের মনমত কখনো বিকৃত আবার কখনো পরিবর্তন করে আইন প্রণয়ন করে। এ কারণেই তাদের প্রণীত আইনের মধ্যে ইসলামী আইনের উপাদান ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল' আকারে ইসলামী আইনের কয়েকটি অধ্যায় তারা বলবৎ রাখে। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম আইনের যে ভিত রচনা করেছিল তা এতই মযবুত ও বাস্তবসম্মত যে, বিশ্ব মানবতা হাজার বছরেরও বেশি সময় এই আইনের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এজন্য বিগত প্রায় দু'শো বছরে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ব্রিটিশ ল' -এর একচ্ছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আইনের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা কোন না কোন পর্যায়ে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু আজকের মুসলমানদের সমস্যা ভিন্নতর। কেননা ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে এতদঞ্চলের একদল লোককে তাদের শিক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার পর এদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। এই নব্য শাসক শ্রেণী ছিল চিন্তা-চেতনায়, মন-মননে ও ভাবাদর্শে কার্যত সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অনুগামী। তারা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিচ্যুত ও বঞ্চিত। ফলে এদেশীয় শাসক শ্রেণী তাদের প্রণীত আইন কাঠামোই বলবৎ রাখে। তাদের ধারণা হলো,

---

*লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউমেনেটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।*

ইসলামে একটি আধুনিক দেশ ও জাতিকে শাসন করার মত উপযুক্ত কোন আইন নেই। কোন বিশিষ্ট চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে এর সম্পর্ক না থাকলেও প্রধানত যে গ্রাউন্ড থেকে এর আমদানী হয়েছে তার মধ্যে এতে আল্লাহতে বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসহীনতা থাকার কারণে কেউ কেউ একে এর অপরিহার্য অঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু মুসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অথচ ইসলাম আধুনিকতা বিবর্জিত ও সময় অনুপযোগী কোন জীবন দর্শন তো নয়ই, বরং ইসলামই চির আধুনিক ও একমাত্র কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান মনোনীত করলাম"।[১]

ইসলাম যেহেতু গতিশীল সর্বাধুনিক জীবনবিধান, কাজেই যুগে যুগে অবস্থা ও প্রয়োজনের দাবি অনুসারে আধুনিক রূপ নেবে, বাহ্যিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হতে পারে কিন্তু মূলে ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে কোন ফারাক দেখা যাবে না। এ ব্যাপারেও আল্লাহর গ্যারান্টি রয়েছে ঃ "কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এতো প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে"।[২]

বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সাল মুতাবিক ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতবুদ্দীন আইবেকের (৬০২/১২০৬) সময় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (১২০৩ খ্রি.) বাংলায় অলৌকিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৩]

এ সময় বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন। মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন। এক শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ তুগলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও -এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন।[৪] বাংলা বিজয়ের পর থেকে ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত (১২০৩ - ১৭৫৪) ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৫]

অতঃপর ব্রিটিশ ও হিন্দুদের অবর্ণনীয় দুঃশাসন ও নির্যাতন মুসলমানদেরকে পাকিস্তান আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। এর ফলশ্রুতিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র রূপ লাভ করে।

কিন্তু যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক পৃথক আবাসভূমি জন্মলাভ করে তা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর মনে আশার আলো না দেখিয়ে বরং তাদেরকে আশাহত করে। ফলে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনও ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে এ দেশের মানুষের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইসলামের আলোকে বিনির্মিত হবে, এ দাবি ও প্রত্যাশা একান্তভাবেই ন্যায়সংগত। তবে কী কারণে তা বাস্তবতার মুখ দেখছে না,

সে কারণগুলো যেমন চিহ্নিত করা প্রয়োজন, তদ্রূপ প্রয়োজন তার সম্ভাবনা কতটুকু তা প্রস্তাবাকারে নিয়ে আসা। আলোচ্য প্রবন্ধটিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি -

**ক. বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যা**

**খ. বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা**

কী কী কারণে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই আমরা প্রথমে সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে প্রয়াশ পাব।

**ক. বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যা**

১. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি
২. রাজনৈতিক কারণ
৩. ধর্মীয় কারণ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনৈক্য
৪. ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব
৫. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা
৬. ইসলামী আইনের কার্যকারিতা ও উপস্থাপনে ব্যর্থতা
৭. আইনের ত্রুটি ও অপপ্রয়োগ
৮. দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচার
৯. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
১০. কোর্ট ফি
১১. আদালতের ভাষা

**১. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি**

আমাদের দেশে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো প্রাচীন আদলের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি সাধারণ শিক্ষা। প্রথমটি 'ইসলামী শিক্ষা' বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি 'আধুনিক শিক্ষা' হিসাবে গৌরববোধ করে। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করেন তারা কুর'আন, হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন বটে কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার তেমন কোনই সুযোগ পান না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, এর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন না। ফলে মানব জীবনের সমস্যার যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান কুর'আন ও হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেন না। এ কারণে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা দ্বারা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণে কার্যত উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারছেন না।

পক্ষান্তরে যারা 'আধুনিক শিক্ষা' অর্জন করেন, তারা প্রচলিত দুনিয়ায় নেতৃত্বদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বটে কিন্তু খাঁটি মুসলিম হিসাবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করেন না। তারা কার্যত চিন্তা ও কর্মে প্রায় অমুসলিম চেতনায় গড়ে উঠেন। আরো একটি বিষয়

বিবেচনায় আনা প্রয়োজন, আমাদের দেশের প্রশাসন যারা অলংকৃত করেন তাদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষিত, অনেক ক্ষেত্রে তারা ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কিংবা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। কাজেই এটি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ত্রুটি ও সমস্যা বটে। এ শিক্ষা পাওয়ার পরও যাঁরা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরের পরিবেশে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলিমরূপে গঠন করেন, সমাজে তাঁরা ব্যতিক্রম।

**২. রাজনৈতিক কারণ**

বাংলাদেশে অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের নাম লক্ষ্য করা গেলেও তারা প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত।
ক. একটি ধারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ঘোর বিরোধী কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ততটা বিরোধী নয়। এ ভূখণ্ডে ইসলামী আইন যাতে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর হতে না পারে সে লক্ষ্যে তাদের পক্ষীয় প্রচার মাধ্যমগুলো অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করছে।
খ. অপরটি হচ্ছে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে। এদেশে ইসলামী আইন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এই দ্বিমুখী রাজনৈতিক চরিত্র ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়।

**৩. ধর্মীয় কারণ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনৈক্য**

বাংলাদেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চান তাদের শ্লোগান, লেখনি ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও কার্যত তারা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত। ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাদের এ অনৈক্য বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থাপন করার পথে বড় অন্তরায়।

**৪. ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব**

বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের আওতায় শিক্ষাদান করা হলেও ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোন ধারণাই দেয়া হয় না। কোন কোন পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে যৎসামান্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একান্তভাবে অপ্রতুল। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছেন। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর পড়ছে। এটাও একটি সমস্যা বটে।

**৫. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা**

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয়ে আলিয়া ও কওমিয়া নামে যে দুটো ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাতেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আধুনিক মন-মানসের উপযোগী কোন শিক্ষাক্রম নেই। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বের হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে কখনো খণ্ডিত ধারণা লাভ করছেন, আবার কখনো অজ্ঞই থেকে যাচ্ছেন। ফলে তারাও জনগণের সামনে ইসলামী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ধারণা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। এটিও একটি বড় সমস্যা।

### ৬. ইসলামী আইনের সর্বজনীনতা ও উপস্থাপনে ব্যর্থতা

ইসলামী আইন যে বহু ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত একটি সর্বজনীন আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম তা ইসলামের পক্ষের শক্তিসমূহ জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে জনগণের ভেতর একটি অস্পষ্টতা, ভীতি, সংশয় ও অজ্ঞতা থেকে যাচ্ছে। এটিও একটি সমস্যা।

### ৭. আইনের ত্রুটি ও অপপ্রয়োগ

বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি আইন ছাড়া প্রায় সকল আইনই ব্রিটিশ প্রবর্তিত। এ আইনের যেমন ত্রুটি আছে তদ্রূপ কিছু ভালো দিকও আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ নেই, বরং ক্ষেত্র বিশেষে রয়েছে অপপ্রয়োগ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সাধারণ মানুষের ভেতর কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হবে সে ব্যাপারে মানুষ সন্দিহান। দীর্ঘকাল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন বলবৎ না থাকা এর অন্যতম কারণ। এটিও একটি সমস্যা।

### ৮. দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচার

হযরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তিকালের সুদীর্ঘ পাঁচ শত সত্তর বছর পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ আবির্ভাব হয়। এই দীর্ঘ সময়ে কোন নবী-রাসূল না থাকায় তদানীন্তন জনগোষ্ঠী যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল এবং শয়তানের অপপ্রচার তাদের সন্দেহের আবর্তে ফেলে দিয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যত বিদায় নিয়েছিল এবং ইসলাম বিদ্বেষী দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম, বিশেষত ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল যে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে, এতে বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এটিও একটি সমস্যা বটে।

### ৯. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

শাসনতান্ত্রিক স্থায়ী কাঠামো ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যার কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও সমস্যার প্রকৃত রূপ প্রায় একই। কেননা এসব দেশে শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক নয় এবং রাজনৈতিক দল জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারীও নয়। ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা লেগেই থাকে এবং এর পরিণামে সামরিক শাসন এসে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। কারণ সামরিক শাসন কখনো রাজনৈতিক সমাধান নয়। ফলে প্রায়শই অস্থিতিশীলতা লেগেই থাকে। এটিও একটি সমস্যা।

### ১০. কোর্ট ফি

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় কোর্ট ফি'র বিধান অত্যন্ত কঠোর। কোর্ট ফি দিতে না পারায় অনেক নিঃস্ব, দরিদ্র বিচারপ্রার্থী সুবিচার লাভ তো দূরে থাক, বিচারপ্রার্থী হয়ে মামলা দায়েরেই করতে পারেন না। অথচ এ ব্যবস্থা বর্তমান সভ্য বিশ্বে বিদ্যমান।

### ১১. আদালতের ভাষা

আদালতের ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদালতের ভাষা যাই হোক আমাদের আদালতসমূহে প্রধানত ইংরেজি ভাষায় মোকদ্দমা, রায় ইত্যাদি লিখতে হয়। অধিকাংশ বিচারকের পক্ষে বিদেশী ভাষার মর্ম উদ্ধার করা সহজ না হওয়ায় মামলায় কখনো কখনো দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়। এটি একটি সমস্যা বটে।

### খ. বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা

মানব জাতির জন্য পৃথিবী ছিল একটি অচেনা জগত। এ জগতে থেকে কিভাবে মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে জান্নাত লাভ করবে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ সে পথই দেখিয়ে গেছেন। তবে পৃথিবীর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। মানুষ চেষ্টা করবে এবং সে তার প্রতিদান লাভ করবে বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ব্যতীত মানুষের কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই, কিন্তু তা অর্জনে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তাই আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে যে সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার সমাধানও নিশ্চয় রয়েছে। এ পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে সুপারিশগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এর মধ্যে যে কোন সম্ভাবনা লুকিয়ে নেই বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ নয়। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্ভাবনাময় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন সাধারণ আইন শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য যেমন প্রয়োজন ইসলামী আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকের, তদ্রূপ প্রয়োজন একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। এই একাডেমীই আমাদের পূর্বপুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী আইনের যেসব গ্রন্থ রয়েছে তা শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদই করবে না, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা জানার জন্য যা অপরিহার্য বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে নতুনভাবে তা ঢেলে সাজাবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামের আইন গ্রন্থসমূহ প্রধানত আরবী ভাষায় রচিত। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ কিংবা একেবারে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার উপর অনুমান করে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা প্রায়শই সেসব আইন ও বিধান সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং ভুল তথ্য প্রচার করেন। এমনকি তাদের অনেকে এরূপ মন্তব্যও করেন, এসব অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কমূলক বিষয় বাদ দেয়া উচিৎ। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যারা এ ধরনের অযৌক্তিক ও অর্থহীন অভিমত পোষণ করেন, এর দ্বারা মূলত তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও বিবেকের দৈন্যদশারই প্রকাশ ঘটান। যদি তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, গত দেড় হাজার বছরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অর্থহীন বিতর্কেই জড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি, বরং তাঁরা পরবর্তী বংশধরের জন্য রেখে গেছেন এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার।

এ ছাড়াও বলা যায়, বিগত দিনসমূহে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ জুড়ে মুসলমানগণ যে কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তার সব ক'টি আইনই ছিল ইসলামী আইনের মূলনীতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাঁরাই

এই রাষ্ট্রের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হতেন। তাঁদের রায় দ্বারা বিচার বিবরণীর বিপুল সম্পদ তৈরি হতো এবং তারা আইনের প্রায় সব ক'টি বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এজন্য প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দলকে বাছাই পূর্বক এই কাজে নিয়োজিত করা, যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি সেসব মূল্যবান বিষয়কেও নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে দিবেন। বিশেষত এমন কতিপয় আইন ও বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ আছে, যার বংগানুবাদ হওয়া একান্ত জরুরী।

কুরআনের আইন পর্যায়ে বিশেষত তিনটি অনবদ্য গ্রন্থ আছে ঃ

ক. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্‌সাস আল-হানাফী (জ. ৩০৫/৯১৭, মৃ. ৩৭৫/৯৮০) প্রণীত 'আহকামুল কুরআন' (আরবী সংস্করণ, দারুল ফিকর, বৈরুত, তিন খণ্ডে সমাপ্ত) উল্লেখ্য যে, ইমাম জাস্‌সাসের লি আহ্‌কামুল কুর'আনের আংশিক বঙ্গানুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১/১২৭২) প্রণীত 'আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন' (আরবী সংস্করণ, বৈরূতঃ বিশ খণ্ডে সমাপ্ত)।

গ. ইমাম আবু বকর মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলী (তিনি ইবনুল আরাবী নামে সমধিক পরিচিত, জ. ৫৬০/১১৬৫, মৃ. ৬৩৮/১২৪০) প্রণীত আহ্‌কামুল কুরআন, আল-কাহিরাঃ ১৩৮৭/১৯৬৭।

এসব গ্রন্থের অনুশীলন আইন শিক্ষার্থীদের কুরআন থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি শিক্ষা দিবে, এতে কুরআনের সমস্ত বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসে এর যেসব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মুজতাহিদগণ এর থেকে যে বিধি-বিধান বের করেছেন সেগুলো যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থসমূহ। যাতে বিধি-বিধান ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। এসবের মধ্য নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী, মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ শরহে নববী ও মাওলানা শিব্বীর আহমাদ উসমানী (র.)-এর ফাতহুল মুলহিম। আবূ দাউদ শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ আওনুল মা'বুদ এবং বাজলুল মাজহূদ; মুওয়াত্তার ভাষ্যগ্রন্থ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) প্রণীত আওজাযুল মাসালিক। মুনতাকাল আখবারের ভাষ্যগ্রন্থ ইমাম শাওকানীর নাইলুল আওতার। মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ইদরীস কান্দালভীর আত-তালীকুস সাবীহ এবং ইমাম তাহাবীর শারহু মা'আনিল আসার। শেষোক্ত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহেরও অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম সারাখসীর 'আল-মাবসূত' এবং শারহুস সিয়ারিল কাবীর; আল-কাসানীর 'বাদাইউস সানাই', ইবনুল হুমামের 'ফাতহুল কাদীর', আল-হিদায়া ও ফাতাওয়া আলামগীরী ইত্যাদি। সম্প্রতি শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টির বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শাফিঈ মাযহাবের কিতাবুল উম্ম, শারহুল মুহাজ্জাব ও মুগনিল মুহতাজুল মুদাওয়ানাহ, হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামার আল-মুগনী, ইমাম ইবনে হাযমের আল-মুহাল্লা, ইবনে রুশদের বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আল-জাযায়েরীর 'কিতাবুল ফিকহ্ আলাল-মাযাহিবিল আরবা'আ' এবং ইমাম ইবনুল কাইয়েমের 'যাদুল মা'আদ'। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিতাবুল খারাজ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদামের কিতাবুল-খারাজ, আল-কাসিমের কিতাবুল-আমওয়াল, হিলাল ইবনে ইয়াহ্ইয়ার আহ্কামুল ওয়াকফ ও ইমাম দিময়াতির আহ্কামুল মাওয়ারীস। এছাড়াও ইমাম ইবনে হাযমের উসূলুল আহকাম, ইমাম শাতিবীর আল-মুয়াফিকাত, ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ইলামুল মুওয়াক্কিঈন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মোটকথা, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। উভয় শ্রেণীর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে একাজ সময় সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব কিংবা দুঃসাধ্য কোনটাই নয়। আরো বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা কিংবা সাধারণ শিক্ষা নয়, বরং হতে হবে এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা যা গ্রহণ করার ফলে একজন শিক্ষার্থী যেমন দীনী ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে তদ্রূপ বৈষয়িক বিষয়েও নেতৃত্বদানের প্রজ্ঞা অর্জন করবে। আমাদের সোনালী যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এদ্বিবিধ চাহিদাই মিটাতো।

২-৩. আমাদের দেশের আড়াই লাখ মসজিদের ইমাম-খতীব, মুয়াজ্জিন, খাদিম ও মুসল্লীগণ, আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসার হাজার হাজার উস্তাদ ও ছাত্র, অগণিত খানকাহ্র পীর ও মুরীদগণ এবং তাবলীগ জামায়াতের সাথে জড়িত লাখ লাখ মুবাল্লিগ ও কর্মীবৃন্দ, বিপুল সংখ্যক ওয়ায়েয ও শ্রোতাবৃন্দ এবং তাফসীর মাহফিলের মুফাস্সির ও শ্রোতাবৃন্দ মিলে বাংলাদেশে বিশাল ইসলামী শক্তি রয়েছে। ধর্মীয় ময়দানে এ শক্তি স্পষ্টতই চোখে পড়ার মতো, কিন্তু রাজনৈতিক অংগনে ইসলামী শক্তি এখনো উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। নির্বাচনে যে ক'টি ইসলামী দল অংশগ্রহণ করেছে তারা সবাই মিলেও মোট ভোটের ২০% ও পায়নি। এর মূলে রয়েছে ইসলামী শক্তির রাজনৈতিক ময়দানে অনৈক্য। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী শিবিরে বৃহত্তর ইস্যুতে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী শক্তির এই অনৈক্য ধর্মপ্রাণ ইসলাম দরদী সাধারণ জনগোষ্ঠীকে হতাশ করে। অথচ ইসলামী শক্তি অহরহ ঐক্যের নসীহত করে বেড়ায় কিন্তু তাদের অনৈক্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি অংগনে পরিলক্ষিত হয়। কুরআন মাজীদে ঐক্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ... তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্য মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে"।[৬]

কাজেই বাংলাদেশে একটি অর্থবহ ও কার্যকর ইসলামী শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

- ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রম ও ষড়যন্ত্রের গভীরতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে।
- বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনেই গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিন্ন বক্তব্য প্রদান ও কর্মপন্থা গ্রহণে যাবতীয় প্রয়াস চালাতে হবে।
- ইসলামী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিদের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- ইসলামী দল, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ওলামায়ে কিরাম যেন পারস্পরিক অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধে জড়িয়ে না পড়েন বরং সর্বোচ্চ ধৈর্য ও ত্যাগের নমুনা উপস্থাপন করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ যেন সুবিধা গ্রহণ করে ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করত অনৈক্যের আবর্তে ফেলে দিতে না পারে সে ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
- প্রচার মাধ্যমসমূহের সংবাদ দেখে কারো বিরুদ্ধে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়ার পরিবর্তে সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : "আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়"।[৭]
- সংবাদের সত্যতা যাচাই করা একান্ত, অন্যথায় মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। পাছে অজ্ঞতা বশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়"।[৮]
- ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহায়ক শক্তি মনে করতে হবে।
- ফিক্‌হী ইখতিলাফী মাসআলা-মাসাইল নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত অনৈক্যের সৃষ্টি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এও স্মরণ রাখতে হবে, ফিক্‌হ শাস্ত্র কুরআন-সুন্নাহ'র ন্যায় চিরন্তন নয় বরং প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহ-কে সামনে রেখে অবস্থা ও পরিস্থিতির দাবি হিসাবে ভিন্নতর সমাধানও দেয়া যেতে পারে। বিশেষত এসব বিষয়ে সালফে সালেহীনের আদর্শ নমুনা হিসাবে সামনে রাখতে হবে।
- ইসলামী দল ও এর নেতৃবৃন্দ যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগামহীন, অসংলগ্ন বিষোদগারমূলক মন্তব্য না করেন কিংবা ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হন সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- সর্বাবস্থায় প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন মুখী দীনী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা সকলে কেন সক্রিয় নন - এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। অবশ্য এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে।

ক. আলিম সমাজের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান । তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামতি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে নিজেদের আসীন করাকেই বড় দীনী খিদমত মনে করেন। ফলে সমাজ পরিবর্তনের বিশাল ঝুঁকি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

খ. যৎসামান্য আয় দিয়ে ঘর-সংসার ও পারিবারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করতে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হওয়ার গুরুত্ব তাদের নিকট খুব একটা অনুভূত হয় না।

গ. ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজের গুরুত্ব সম্পর্কীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত না থাকাও একটি বড় কারণ।

ঘ. সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসাবে মান্য করা যে অপরিহার্য-এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভীষণ অভাব।

মোটকথা, দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণে বৃহত্তর ঐক্য সময়ের দাবি। এ ঐক্য প্রতিষ্ঠা যত বিলম্ব হবে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ততো পিছিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইসলামী শক্তি ও প্রতিষ্ঠান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে ততো তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।

৪. ধর্ম (ইসলাম) ও রাজনীতি কি স্বতন্ত্র দুটি বিষয়, না পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা কি আদৌ বিবেচ্য বিষয় না সেকেলে, এবিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। কেননা এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমরা প্রথমেই আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইসলামী আইন, বিচার ব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে, অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে।

**ধর্ম (ইসলাম) ও রাজনীতি**

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পার্থিব জীবনে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং পরকালীন মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা প্রদান করে ইসলাম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিচার-ব্যবস্থাসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত এবং খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইনজীলে যেসব দিকনির্দেশনা ছিল তা বিকৃত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আইন-আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা নেই। অতএব ধর্মকে রাজনীতি থেকে বাদ দিতে হলে 'একমাত্র ইসলাম' ছাড়া অপর কোন ধর্মের উপর আঘাত আসে না। পক্ষান্তরে ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করলে বা ধর্ম থেকে রাজনীতি বাদ দিলে ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। অতএব ধর্মকে 'পবিত্র' আখ্যা দিয়ে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি বা প্রস্তাব সুকৌশলে ও অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ইসলামকে অকার্যকর করার এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা এবং ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি করা-দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কেননা যেসব রাজনৈতিক দল

কুরআন-সুন্নাহ'কে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামী বিধি-বিধান, শাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে ও দলের অভ্যন্তরে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে, কুরআন-সুন্নাহ'র মূলনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে মাহনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে একটি আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করে মাঠে ময়দানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাদের পরিচালিত রাজনীতিই মূলত ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি। এটা কখনো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা-বলা সমীচীন নয় বরং এ অপবাদ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অনভিপ্রেত।

পক্ষান্তরে যাদের দলীয় ইশতেহারে আদর্শের ভিত্তি হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয় না, যাদের দলীয় কর্মসূচিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ নেই, যাদের বাস্তব জীবন কুরআন-সুন্নাহ'র আদর্শের সাথে মিল নেই তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সময় সরল ও ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিজেদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়ার অভিনয় করাকেই বলা হয় 'রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মের ব্যবহার'। এ ধরনের পলিসি সরলপ্রাণ ধার্মিক মানুষের সাথে একটি স্পষ্ট প্রতারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। এটা সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু যারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের চর্চা করেন, অনুসরণ করেন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মত কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সমাজের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সংহতি পরিপন্থী কোন কর্মসূচি কোন পর্যায়ে গ্রহণ করেন না, তাদের কার্যক্রমকে কোন অবস্থাতেই ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার হিসাবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। বিদগ্ধজনদের কাছে এই পার্থক্যটুকু পরিষ্কার থাকা একান্ত আবশ্যক।

### ইসলামের ভিত্তিমূলেই রয়েছে রাজনীতি

ইসলামের মূল ভিত্তি 'কালেমা তায়্যিবা'-ই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির উৎস। কালেমার ঘোষণা ও অন্ত র্নিহিত দাবি হলো, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং অপর সকলের ও সব কিছুর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অনুসরণের অঙ্গীকার করাই কালেমার ঘোষণার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক। তাই একে কোন অবস্থায়ই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই। এই কালেমার ঘোষণাই মানুষের গোটা জীবনকে খোদাহীন মতাদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনার একটি নিঃশর্ত অঙ্গীকার। এই কালেমার ঘোষণা দিয়ে যারা ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয় তারা ইসলাম (ধর্ম) হীন রাজনীতি অথবা রাজনীতিবিহীন ইসলামের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

ধর্ম (ইসলাম)-কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার কিংবা ইসলামের নামে রাজনীতি করার প্রসঙ্গ তুলে যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সতত সোচ্চার

তারা 'ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর থেকে আলাদা' এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে যেসব অবান্তর যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে তার একটি হলো, "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, একে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়"। অপরটি হলো, "পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনলে ধর্মকে অপবিত্র করা হয়"। এর জবাব এই যে, প্রচলিত অর্থে এসব লোক নবী-রাসূলগণকে নিছক ধর্মগুরু এবং আসমানী কিতাবসমূহকে নিছক ধর্মগ্রন্থ মনে করে আসমানী কিতাবসমূহ, বিশেষ করে আল-কুরআন সম্পর্কে এদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। শৈশবের শেখা কয়েকটি সূরা, কিছু দোয়াই তাদের মূলধন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "নিশ্চয় আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে ..."।[৯]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[১০]

অতএব "ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার" এই ভ্রান্ত মতবাদ অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ইসলামকে মানব জীবনের ব্যাপক পরিসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না ...."।[১১]

অপর এক আয়াতে আছে ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়"।[১২]

**যে রাজনীতি ধর্মকে অপবিত্র করে**

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা ইসলাম কায়েমের ঘোর বিরোধী তারা "দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই"[১৩] এবং "সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক"[১৪] আয়াত দুটোকে তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে ব্যবহার করে কিন্তু তাদের এ ধারণা কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বরং প্রতারণার শামিল। কারণ বিষয়টি ঈমান আনা অথবা না আনার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করবে সে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বাধ্য। এখানে মানা কিংবা না মানার কোন এখতিয়ার তার নেই।

তাদের আরেকটি অজুহাত হল, "পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে অপবিত্র করা হয়"। এই যুক্তিটি রীতিমত হাস্যকর। কেননা ধর্ম এমন ঠুকনো জিনিস নয় যা রাজনীতির ছোঁয়া লাগলেই অপবিত্র হয়ে যায়? সেই সাথে প্রশ্ন জাগে, যে রাজনীতি ধর্মের মত পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করে, সে রাজনীতি কি সভ্য -সচেতন মানুষের কাম্য হতে পারে? যে অপবিত্র রাজনীতির পরশে পবিত্র ধর্ম অপবিত্র হতে পারে সেই রাজনীতি গোটা মানব সমাজকেই অপবিত্র ও কলুষিত করে চলেছে। অতএব মানব সমাজের পবিত্রতার স্বার্থেই পবিত্র ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের স্বার্থে এর কোন বিকল্প নেই।

যারা ইসলামী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা চায় তারা অপবিত্র কোন রাজনীতির সাথে ইসলামের মিশ্রণে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের নিজস্ব রাজনীতি আছে, আছে স্বকীয়তা। তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে পবিত্র ধর্মের অপবিত্র হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এটি ইসলাম বিরোধীদের নিছক একটি অপপ্রচার।

**অমুসলিম নাগরিক প্রসঙ্গ**

ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধীদের আরেকটি অপপ্রচার হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে। অর্থাৎ সেখানে তারা নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কীভাবে বসবাস করবে? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

ইসলাম রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের 'যিম্মী'[১৫] বলা হয়। তাদের জীবন, সহায়-সম্পত্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে ইসলামী রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ। আল-কুরআনের শিক্ষা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতিমালা দ্বারা তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল-কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও অধিকার দান বিষয়ে যেসব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

**আল-কুরআনে**

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে"।[১৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ "তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার"।[১৭] অপর এক আয়াতে আছে ঃ "সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক"।[১৮]

এ সব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা উপেক্ষিত তো নয়ই বরং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

অমুসলিমদের সাথে সদয় আচরণ ও ন্যায়বিচার করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে তারা তো যালিম"।[১৯]

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত, তা উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের নমনীয়তা এতদূর যে, তাদের ধর্মমতে মদ্যপান শূকরে গোশত ভক্ষণ ইত্যাদি কাজ সংগত - যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ - তারা তা ভক্ষণের সুযোগ পাবে।

অমুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও সংরক্ষণ ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো- যদি তোমরা বিবাহের নিমিত্তে তাদের দেনমোহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা গোপন প্রণয়নী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[২০]

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইনেই মীমাংসিত হবে। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে : "তারা তোমাদের উপর কীভাবে বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর আদেশ আছে? ...।[২১] অপর এক আয়াতে আছে : "ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় ...।"[২২]

আল-কুর'আন কোন প্রকার অসহিষ্ণুতা কিংবা উগ্রতার অনুমতি দেয় না। সংখ্যালঘুদের ধর্ম, দেবতা ও প্রতিমা তথা কোন বিষয়ে ভর্ৎসনা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে ..."।[২৩] অপর এক আয়াতে আছে : "তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না"।[২৪]

### আল-হাদীসে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ মানুষের (সংখ্যালঘু) উপর অবিচার করবে কিংবা অধিকার খর্ব করবে অথবা সাধ্যের বাইরে তার উপর বোঝা চাপাবে কিংবা তার অসম্মতিতে তার নিকট থেকে কোন জিনিস আদায় করবে তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই কিয়ামতের দিন দাবি উত্থাপন করবো"।[২৫] অপর এক হাদীসে আছে, "তোমরা যদি কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হও, আর সে জাতি তাদের নিজেদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাদেরকে কর দিতে সম্মত হয় তাহলে পরবর্তীতে নির্ধারিত করের চেয়ে একটি শস্য কণাও বেশি গ্রহণ করবে না। কেননা তা তোমাদের জন্য জায়েয নয়"।[২৬]

### ঐতিহাসিক দলীলপত্র

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক হিজরী ১ম সনে (৬২২ খ্রি.) মদীনার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তা ইতিহাসে 'মদীনা সনদ'[২৭] নামে পরিচিত। উক্ত সনদ তিনি তৎকালীন অমুসলিমদের সাথেই স্বাক্ষর করেছিলেন, এ সনদে অনেকগুলো ধারা ছিল।

ইসলামের দ্বিতীয় মহান খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় (৬৩৮ খ্রি.) জেরুসালেম যে চুক্তি বলে হস্তান্তর করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

"এটা হলো সেই সনদ যা আল্লাহর বান্দা ও মুমিনদের অধিনায়ক ইলিয়ার জনগণকে মঞ্জুর করেছেন। তিনি তাদের প্রাণ, সম্পদ, গির্জাসমূহ, ক্রুশস্থাপন ও প্রদর্শন ইত্যাদি হেফাযতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না ..."।[২৮]

খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) একবার তাঁর এক গভর্নরের কাছে পত্র প্রেরণ করেন, যার মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহ তা'আলার ভৃত্য আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীযের পক্ষ থেকে গভর্নর আদী ইবনে আরতাত এবং তার সঙ্গী মুমিন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা পাঠাচ্ছি। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিরাপত্তাধীন সংখ্যালঘুদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করবে। তাদের কেউ যদি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার যদি সহায়-সম্পদ না থাকে তবে তার জন্য তোমাদের অর্থ ব্যয় করবে। কেউ যদি তার ক্ষতিসাধন করে, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে ..." ।[২৯]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, এমন অভিযোগ করা হয়। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রয়োগ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রে মুসলিম নাগরিকদের অনুরূপ। আইনের কোন কোন ধারা কেবল মুসলিম নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য নয়। এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

**ফৌজদারী দণ্ডবিধি (হুদূদ)**

ইসলামের হুদূদ আইন তথা ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কোন মুসলমান কোন অমুসলিমের মাল চুরি করলে অথবা কোন অমুসলিম কোন মুসলিম নাগরিকের মাল চুরি করলে উভয়ের বেলায় একইরূপ দণ্ড কার্যকর হবে। কোন ব্যক্তির উপর যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক যে-ই হোক সে মিথ্যা অপবাদের নির্ধারিত দণ্ড ভোগ করবে। অনুরূপভাবে যেনার অপরাধের শাস্তিও মুসলিম অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মদ্যপানের ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিককে শাস্তির আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে।[৩০] তবে তারা মাদকাসক্ত হয়ে কোন অপরাধকর্মে লিপ্ত হলে সেই অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের মাদক গ্রহণ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার পর্যায়ে পৌঁছলে প্রশাসন তাদের মাদক গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে।

মানবজীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তিও (কিসাস) মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন মুসলিম নাগরিক কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে বা তাদের দেহের ক্ষতিসাধন করলে অথবা কোন অমুসলিম নাগরিক কোন মুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধে অনুরূপ কর্ম করলে উভয়ের বেলায় ইসলামী আইন প্রযোজ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কোন মুসলিম ব্যক্তি জনৈক অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং বলেন, " যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই" ।[৩১]

হযরত উমর (রা.)-এর আমলে বকর ইবনে ওয়াইল গোত্রের এক মুসলিম ব্যক্তি হিরাবাসী জনৈক অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করলে উমর (রা.) অপরাধীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট সমর্পণ করার নির্দেশ দেন এবং তারা তাকে হত্যা করে।[৩২]

হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে উমর (রা.)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ পিতৃ-হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হুরমুযান ও আবু লু'লু-র কন্যাকে হত্যা করেন। উক্ত অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[৩৩]

এসব কারণে ফকীহ্গণ এই বিধি প্রণয়ন করেন যে, কোন অমুসলিম নাগরিক কোন মুসলিম নাগরিক কর্তৃক ভুল বশত (খাতাআন) নিহত হলে তার ওয়ারিসগণকে ভুলবশত হত্যার পূর্ণ দিয়াত (রক্তপণ) সোপর্দ করতে হবে।[৩৪]

### দেওয়ানী আইন

ইসলামের দেওয়ানী আইনও মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিমগণ পূর্ণরূপে ইসলামের দেওয়ানী আইনের অধীন। এই আইনের অধীনে মুসলমানদের উপর যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তা অমুসলিমদের উপরও বর্তায়, যেসব অধিকার সৃষ্টি হয় তাও তারা সমভাবে ভোগ করবে।[৩৫]

### ইসলামী রাষ্ট্রে নারী

যারা ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েমের ঘোর বিরোধী তারা সরলপ্রাণ মানুষের মাঝে এই অপপ্রচার চালায় যে, দেশে যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েম হয়, তবে নারী তার মৌলিক অধিকার হারাবে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটিকে যেহেতু অন্তরায় মনে করা হয় তাই বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে।

নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি এই যে, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতের কর্মফলেও সমান, তবে সর্বাবস্থায় উভয়ের কর্মক্ষেত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য এক নয়। প্রথমেই আসা যাক শিক্ষা সম্পর্কে।

ইসলাম নারীশিক্ষা অস্বীকার তো করেইনি, বরং একমাত্র ইসলামই নারী ও পুরুষ উভয়ের বিদ্যার্জন অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। হাদীসে আছে, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিদ্যার্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয)"।[৩৬]

নবী করীম (সা.)-এর সময় হযরত আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা, আসমা বিনতে উমাইস (রা.) প্রমুখ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।[৩৭]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এমন শিক্ষাই তাদের দিতে হবে। নারীদেরকে নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষিত নারী সমাজকে এমন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে হবে যা শুধু মহিলাদের জন্যই নির্দিষ্ট। মোটকথা, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যা বেশীরভাগ সময় পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ধরায় এবং অশ্লীলতা ছড়ায়। রাষ্ট্রীয়

কর্মকাণ্ডে নারীর বিচরণ ইসলাম অস্বীকার করে না। নারীর প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

ক. নারী প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে না,

খ. নেতৃত্ব দিতে পারবে,

গ. নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হতে পারবে। কিন্তু সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। তবে নারী তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং প্রতিনিধিও নির্বাচিত হতে পারে।[৩৮]

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে ইসলাম বিরোধীরা বিষোদগার করতে চায় এবং নারী সমাজকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অথচ ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা ইনসাফের দাবি হচ্ছে, উভয়ের অংশ সমান হওয়াও সমীচীন নয়। কারণ ইসলামে পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সবই স্বামীর দায়িত্ব। পারিবারিক পর্যায়ে নারীর কোন আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয় না। তার অঢেল সম্পত্তি থাকলেও স্বামী তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না বা স্ত্রীও পরিবারের জন্য তা ব্যয় করতে বাধ্য নয়।

ইসলামে পর্দা প্রথা নারীর মর্যাদার রক্ষাকবচ। ইসলাম বিরোধীরা একে অবরোধ বলে অপপ্রচার চালায়। অথচ ইসলামী ব্যবস্থায় নারী তার পোশাকের শালীনতা রক্ষা করে সকল কাজই করার অধিকার রাখে। তার কর্মক্ষেত্রে গমন, নিজস্ব ব্যবসায় পরিচালনা, স্ব-উদ্যোগে সহায়-সম্পদ অর্জন, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কোনটিই তার জন্য নিষিদ্ধ নয়। আজকাল নারীর পর্দা বলতে একদল লোক তাকে ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখা বুঝাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা পোশাকের শালীনতা বজায় রেখে নারীকে বাড়ির বাইরে যাবার বিষয়ে নিষেধ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়্যা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[৩৯]

সুতরাং বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে নারী তার অধিকার তো হারাবেই না, বরং ন্যায্য অধিকার ভোগের সুযোগ লাভ করবে। যারা নারীদের বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিপক্ষ মনে করে তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলাম বিদ্বেষী।

৫. আমাদের দেশে দু'টি ধারার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। একটি আলিয়া মাদ্রাসা এবং অপরটি কওমী মাদ্রাসা। এতদুভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটিই ইসলামের সকল দিকের স্বচ্ছ নির্দেশনা প্রদান করতে পারছে না। কাজেই এতদুভয় শিক্ষায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান করতে হবে এবং সাথে সাথে ইসলামের সোনালী দিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে প্রচার মাধ্যমসমূহও বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া অসাধ্য হবে না, সময়সাপেক্ষ হতে পারে। ব্যাপক বই-পুস্তক প্রণয়ন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখা, মসজিদের ইমামগণ খুতবায় এবং ওয়ায়েযগণ তাঁদের বক্তৃতায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন।

৬. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন -একথা ইসলামী ব্যক্তিত্ব কিংবা দল প্রচার করলেও তারা তা সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে কিংবা বিশ্বাস করাতে পারছেন না। জনগণ যেহেতু দীর্ঘকাল থেকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত, কাজেই তাদের মধ্যে সংশয় থাকা বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষত ইসলামের দণ্ডবিধি সম্পর্কে ইসলাম বিরোধী শক্তির অপপ্রচার সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা একে মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসাবে প্রচার করে মানব মনে ভীতির সঞ্চার করছে। পশ্চিমা জগত হত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের ইসলামী শরী'আ অনুমোদিত শাস্তির ব্যাপারে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এটাকে তারা 'মানবাধিকার পরিপন্থী' আখ্যায়িত করে মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। অথচ মানব সমাজকে অপরাধমুক্ত শান্তিময় সমাজে পরিণত করার জন্য ইসলামী দণ্ডবিধি ও শরয়ী আইনই বাস্তবসম্মত। খুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ ও যেনা-ব্যভিচারমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং আইন হিসাবে দণ্ডবিধি কার্যকরই হচ্ছে এর একমাত্র প্রতিষেধক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের (হত্যার বদলে হত্যা) মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে ..." ।[৪০]

ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার ও যৌন অপরাধের ন্যায় নৈতিকতা বিরোধী কাজ মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উন্নত ও সভ্যতার দাবিদার দেশগুলোতে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানব রচিত আইন দ্বারা এসব অপরাধ ক্ষণিকের জন্য কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা আদৌ সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে একটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, একটি সমাজে ইসলামের দণ্ডবিধি চালু করার পূর্বে এই আইনগুলো কার্যকর হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। যেমন, চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রয়োগ করার পূর্বে দেখতে হবে, লোকটি পেটের ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি-ডাকাতি করেছে কিনা। কেননা সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এমনিভাবে যেনা-ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে সামাজিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের বিবাহের অক্ষমতা, দারিদ্র্য ও যৌতুকের কারণে দরিদ্র পিতামাতার কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা থাকা, সমাজে অবাধ যৌনচর্চাসহ যৌন অপরাধ সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি যৌন অপরাধ ও যেনা-ব্যভিচার সংঘটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কাজেই এ অপরাধের শরী'অত সম্মত শাস্তি প্রয়োগের আগে এসব পরিবেশ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য।

শরী'অতের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রম-নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। লোকেরা জানতে চেয়েছে মদ পান সম্পর্কে শরী'অতের ফয়সালা কি? প্রাথমিক জবাবে বলা হয়েছে, মদের মধ্যে উপকারিতা-অপকারিতা দুটোই আছে, তবে অপকারিতা বেশি।[৪১] এই জবাবের প্রেক্ষিতে অনেকে মদ ছেড়ে দিতে শুরু করলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না।[৪২] উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে নামায ফরয করা হয়েছে। এই ঘোষণার

ফলে প্রথম পর্যায়ের তুলনায় আরো বেশি সংখ্যক লোক মদ্যপান ছেড়ে দিল। তৃতীয় পর্যায়ে এসে ঘোষণা করা, 'হলো মদ-জুয়া অপবিত্র জিনিস, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা বর্জন করো।'[৪৩] ফলে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতিরেকেই এর বিলুপ্তি ঘটেছিল। এ ভাবেই প্রতিটি শাস্তির বিধান পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হওয়াটাই ইসলামী পদ্ধতি। এরপরও যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, মানব সমাজকে পূতঃ পবিত্র রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের জঘন্য অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়বিচারের অনিবার্য দাবি। কাজেই বলা যায়, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা যদি দলীল প্রমাণসহ উপস্থাপন করা যায় তাহলে মানুষের মধ্যকার ভুল-ত্রুটি কেটে যাবে এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ বেগবান হবে।

৭. বাংলাদেশ মূলত ব্রিটিশ আইন দ্বারা শাসিত। এখানে হাতে গোনা কয়েকটি ইসলামী আইন (যেমন বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধান, উত্তরাধিকার, শুফ'আ, হেবা, ওয়াকফ এবং ওসিয়্যত) বলবৎ আছে, যা কেবল ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ আইন যা আছে তাও আবার ষোলআনা কার্যকর নেই। এ আইনের ত্রুটি ও অপপ্রয়োগ উভয়ই লক্ষণীয়। ফলে সাধারণ মানুষ যেমন ইসলামী আইন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ, তদ্রূপ তা কায়েম হলেও কতটা সুফল বয়ে আনবে সে ব্যাপারেও তারা সন্দিহান। এ সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে হলে পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা চর্চা শুরু করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৯৮৩ খ্রি.) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শুরুতে অনেকেই এই ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, দোদুল্যমানতা ও সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আজ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, গোটা অর্থব্যবস্থাও যদি ইসলামের আদলে বিন্যাস করা যায়, তবে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা আরো ভাল করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষামূলকভাবে অনেক সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের শাখা খুলেছে। কাজেই পর্যায়ক্রমে যদি ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা যায় তাহলে মানুষ সুফল পেতে থাকবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই সম্ভাবনাময় একটি দেশ।

৮. বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে সত্য-অসত্য যে কোন তথ্যই মানুষের নিকট মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায়। তবে কখনো কখনো সত্য তথ্যের চেয়ে ঈমান বিধ্বংসী অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত ত্বরিত এসে পৌঁছে। প্রচার মাধ্যমসমূহ অনেক সময় ইসলামের বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ায়। প্রচার মাধ্যমসমূহের এ আগ্রাসন প্রায় সকল মুসলিম দেশ ও জনপদকে গ্রাস করতে উদ্যত। প্রচার মাধ্যমগুলো মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে ইসলাম সম্পর্কীয় কতিপয় বিষয় বিকৃত করে তুলে ধরে। যেমন-

ক. ব্যভিচারের শাস্তি-এক শত বেত্রাঘাত কিংবা মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে বিষোদগার করে। অথচ এই শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সাক্ষী হিসাবে চারজন বালেগ পুরুষ কর্তৃক ব্যাভিচাররত অবস্থায় দেখার শর্ত অপরিহার্যরূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং অপবাদকারীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে তা উল্লেখ করে না।

খ. চুরির শাস্তি নিয়ে তারা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনসাধারণকে আতংকগ্রস্ত করে। অথচ পেটে ক্ষুধার কারণে যে ব্যক্তি চুরি করে ইসলাম তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয় না যতক্ষণ তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারে।

গ. উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কেও অজ্ঞতার সুযোগে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অর্থাৎ একজন পুত্র সন্তানের সমান দু'জন কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার একান্তভাবেই বিজ্ঞান সম্মত। কারণ পুত্র সন্তানকে নিজ পরিবার, মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের বিশেষ কোন আর্থিক দায়িত্ব নেই।

ঘ. ইসলাম অনুমোদিত একাধিক বিবাহের সমালোচক ইসলাম বিরোধী একটি গোষ্ঠী। অথচ একান্ত প্রয়োজনে কতিপয় কঠিন শর্তসাপেক্ষে ইসলাম তা বৈধ ঘোষণা করেছে। অবশ্য এর সাথে বলে দিয়েছে একজন স্ত্রী গ্রহণই উত্তম কিন্তু যারা এর কট্টর সমালোচক তারা অসংখ্য উপ-পত্নী গ্রহণ ও অবৈধ যৌনাচারকে দূষণীয় মনে করে না। এমনকি তারা নারীদের একাধিক স্বামী গ্রহণের পক্ষেও অভিমত দিয়ে থাকে এবং সমকামিতাকেও অবৈধ ও অনৈতিক মনে করে না। অথচ তা নৈতিকতা বিরোধী জঘন্য কাজ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একাধিক বিবাহ, নারী শিক্ষা বনাম পর্দা প্রথা, ধর্ম ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার মাধ্যম বিভ্রান্তি ছড়ায়। তা একান্তভাবেই অমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ যারা চোরের শাস্তি হাত কাটা এবং ব্যভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত কিংবা মৃত্যুদণ্ডের সমালোচক, তারাই মূলত এটম ও পরমাণু অস্ত্রের আবিষ্কারক, যা দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশু ও নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে-যার প্রমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এরাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম ও সাধারণ নিরীহ মানুষের রক্তের হোলিখেলা খেলছে। সুতরাং ইসলাম বিরোধী শক্তির মিথ্যাচার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে এবং ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যম পরিবেশিত মিথ্যা তথ্য সম্পর্কে সতর্ক থেকে আন্তর্জাতিক মুসলিম প্রচার মাধ্যম গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এভাবেই ইসলাম বিরোধী শক্তির অপকর্ম সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ঃ "একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে যাওয়ার মত কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন, তা হচ্ছে মিথ্যা। মানুষ যখন মিথ্যা বলে, তখন সে আল্লাহর আইন লংঘন করে। আর যখন আল্লাহর আইন লংঘন করে তখন সে কুফরী করে। যখন কেউ কুফরী করে তখন সে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়"।[৪৪]

৯. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অন্যতম সমস্যা। অথচ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরই একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় দেশবাসীর মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ব্যক্তি যত যোগ্য ও নিঃস্বার্থই হোক তাকে ভাগ্য বিধাতা হিসেবে মেনে নেয়া কোন অবস্থায়ই সমীচীন নয়। যদি কাউকে ক্ষমতার একক কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয় এবং হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে তবে দেশে চরম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই কোন দেশের স্থায়ী কল্যাণের জন্য একটি স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকা অপরিহার্য। দেশের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত

বংশধরদের উন্নতি এবং স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এরই উপর মুখ্যত নির্ভরশীল। দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে, সে ব্যাপারে স্থায়ী বিধিব্যবস্থা না থাকলে যিনিই ক্ষমতায় আসবেন তিনিই তার ইচ্ছে মতো শাসনতন্ত্রকে যখন খুশী রদবদল করবেন। কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের জন্য এর চেয়ে অবমাননাকর দৃষ্টান্ত আর হতে পারে না। সুতরাং দেশে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে তথা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে আসীন করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার। কাজেই ইসলামী শক্তিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১০. বিচার ব্যবস্থায় কোর্ট ফি প্রথা বাতিল করতে হবে। এটা ব্রিটিশ আইনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দিক। ইসলামের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। কারণ আদালতের কাজ হচ্ছে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, দুঃস্থ-দরিদ্র লোককে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা নয়। বিচার ব্যবস্থাকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আদৌ কাম্য নয়, বরং এটিকে ইবাদত এবং জনহিতকর কাজ মনে করা উচিত। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কোর্ট ফি প্রথা বিলুপ্ত করা হলে আদালতের খরচ কে বহন করবে? এর জবাবে দু'টি কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক : (ক) ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এতো বড় আদালত ও বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন নেই, যাকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য মনে করছে। বিচারের ও মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রতাও আজকের তুলনায় অনেক কমে যাবে। অতঃপর সমাজের নৈতিক চরিত্র, সমাজ কাঠামো ও অর্থনীতির সংস্কার ও মামলাকে কমিয়ে আনতে সহায়তা দিবে এবং অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, খলীফা উমর (রা.)-এর যুগে কুফার বিচারপতি হযরত সালমান ইবনে রবী'আ আল-বাহিলী (রা.) তাঁর আদালতে একাধারে চল্লিশ দিন হাতের উপর হাত রেখে বসা ছিলেন - শুধু এজন্য যে, তাঁর কাছে কোন মামলাই আসেনি।[৪৫]

এর থেকেও একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় হযরত উমর (রা.) মদীনার বিচারপতি ছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর অতিবাহিত হলেও তাঁর কাছে একটি মোকদ্দমাও বিচারের জন্য উপস্থাপিত হয়নি।[৪৬]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাইজেরিয়ায় ১৮০৩-১৯০৩ সন পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত চালু ছিল। পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ এবং খ্রিষ্টবাদী সভ্যতা নাইজেরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সনে নাইজেরিয়ায় ইসলামী খিলাফতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুকোতো খিলাফত পশ্চিম আফ্রিকায় একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এর প্রভাব ছিল বর্তমান নাইজেরিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত। ২০০০ সন নাগাদ ১০টিরও বেশি রাজ্যের গভর্নরগণ জনসাধারণের চাপে ইসলামী শরী'আ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। সেখানকার বিচার প্রশাসন ইসলামের আলোকেই বিন্যাস করা হয়েছে।[৪৭]

খ. এরপরও আমাদের বিচার ব্যবস্থার খরচের যে সামান্য চাপ আমাদের কোষাগারে পড়বে তা বিচার প্রার্থীর উপর ধার্য না করে ঐ সব লোকের উপর ধার্য করা যেতে পারে যারা আদালত থেকে

অযাচিতভাবে লাভবান হতে আসবে। যেমন মিথ্যা মামলাকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ও আদালতের সমন বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শনকারী। অপরাধীদের নিকট থেকে যে অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায় হবে তাও এর সাথে যোগ হবে এবং একটি বিশেষ সংখ্যক ডিক্রি যাদের পক্ষে দেয়া হবে, তাদের উপর বিশেষ কর বসাতে হবে। এরপরও যদি বিচার বিভাগের বাজেটে কোন ঘাটতি দেখা দেয় তবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পূরণ করা হবে। কারণ মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

১১. আদালতের ভাষা বিচার ব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই এ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাদশাহী আমলে এদেশে আইন আদালত ও সরকারি কার্যালয়ের ভাষা ছিল ফার্সি। ১৮৩৫ সনে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৩৭ সন থেকে ফার্সির পরিবর্তে কোর্ট কাচারিতে দেশীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা প্রদেশে বাংলা ভাষা চালু করা হয়। তখন নিম্ন আদালতে বাংলা এবং উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা শুরু হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশে অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ইংরেজির সাথে বাংলা ভাষাও চালু ছিল। সাধারণত মফস্বলের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বেশিরভাগ কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো, আর বড় শহর ও নগরের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতেও বেশিরভাগ কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতো। ১৯৪৭ সনে ঢাকা মফস্বল শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকা নগরীর অধস্তন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ও অন্যান্য বড় শহরগুলোর অধস্তন দেওয়ানি আদালতে বাংলার চেয়ে ইংরেজির ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সনের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা[৪৮] বলে ঘোষণা করা হলেও অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার হ্রাস পায়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে উপরোক্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলন নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৭ সনে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি করা হয়। এতদসত্ত্বেও এখনো সকল আদালতে, বিশেষত অধস্তন আদালতগুলোতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত আছে। ইংরেজির সাথে বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আইনসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়ায় এবং বেশিরভাগ আইনজীবীর ইংরেজি জ্ঞান সীমিত হওয়ায় অধস্তন আদালতসহ দেশের সকল আদালতের কাজকর্ম ইংরেজি ভাষায় বেশি দিন চালু রাখা সম্ভবপর নয়। ধীরে ধীরে সকল আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। কিন্তু বাংলা ভাষা আইন আদালতে ব্যবহারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করা হচ্ছে বাংলা ভাষায় রচিত আইন বইয়ের অপ্রতুলতা। অথচ বাংলা ভাষায় প্রচুর সংখ্যক আইন বই আছে। বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে আইনের গ্রন্থগুলো আরো ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও রচনা করা প্রয়োজন। আইনের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনার সাথে সাথে আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হবে। নচেৎ অচিরেই এমন এক সংকটের সৃষ্টি হবে যে, ইংরেজি ভাষা

ব্যবহারের ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার কমে যাবে এবং রায় দানে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হবে। এজন্য বাংলায় আইনের গ্রন্থ রচনার ও আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলায় আপিল, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করার পথে বাধা দূর করা প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীতে যত নবী -রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভাষায় স্বজাতির কাছে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কাজেই অধিকাংশ মানুষের নিকট যে ভাষা বোধগম্য নয় তা আদালতের একমাত্র ভাষা হিসাবে নির্ধারিত না করে সকলের নিকট বোধগম্য ভাষাই ব্যবহার করা সমীচীন। অথবা এমন হতে পারে যে, ইংরেজী ভাষার সাথে বাংলা অনুবাদ থাকবে। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, তাঁদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য"।[৪৯]

## উপসংহার

প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের শুভ যাত্রা শুরু হয় এবং নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি ঘটে সর্বকালের সর্বযুগের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম"।[৫০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে বিশ্ব মানবতার জন্য দু'টি পথনির্দেশ রেখে যান - যা অনুসরণ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-হাদীস।[৫১]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ মূলত কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকেই পরিচালিত হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে মানুষ কুরআন-সুন্নাহ'র বিধান থেকে পিছু হটতে থাকে। তারপরও বলা যায়, উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের (১২০৩ খ্রি.) পর থেকে (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) পলাশীর প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত ৫৫৪ বছরে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। এর ফলে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৫২] এভাবে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) ১৯০ বছর চলে যায়। কিন্তু উপমহাদেশের জনগণ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের চরম বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নিয়ে 'পাকিস্তান' এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে 'ভারত' নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু এ অবস্থাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসমতার কারণে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝে অসন্তোষ ঘনীভূত হতে থাকে। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে আসন করে নেয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে তাও তিন যুগের অধিককাল সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতার সত্যিকার সুফল মানুষের দোর-গোড়ায় আজও পৌছেনি। আমরা মনে করি, এর মূলে রয়েছে সততা, দেশপ্রেম, যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার চেতনার অভাব এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে কায়েম না থাকা।

**গ্রন্থপঞ্জি**

১. আল-কুর'আন, ৫ঃ৩
২. আল-কুর'আন, ৪১ঃ২২
৩. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৪/১৯৯৪, পৃ. ১৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৫. প্রাগুক্ত
৬. আল-কুর'আন, ৩ঃ১০৩ - ১০৫
৭. আল-কুর'আন, ৪ঃ১২৮
৮. আল-কুর'আন, ৪৯ঃ৬
৯. আল-কুর'আন, ৫৭ঃ২৫
১০. আল-কুর'আন, ২ঃ২০৮
১১. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৩৬
১২. আল-কুর'আন, ৪ঃ৬৫
১৩. আল-কুর'আন, ২ঃ২৫৬
১৪. আল-কুর'আন, ১৮ঃ২৯
১৫. যিম্মী শব্দটি আরবী শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অর্থ জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা, দায়দায়িত্ব প্রতিরক্ষা ইত্যাদি। শব্দের অর্থ জীবন, মান-ইয্যত ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রাপ্ত মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক। অর্থাৎ মুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন, সম্পদ ও মান-ইয্যতের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের উপর গ্রহণ করে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদেরকে 'যিম্মী' বলা হয়। এটি কোন অপমানকর পরিভাষা নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে তারা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলে বেতন-ভাতা ছাড়াও একটি বিশেষ আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। (মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিক্হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০)
১৬. আল-কুর'আন, ২ঃ২৫৬
১৭. আল-কুর'আন, ১০৯ঃ৬
১৮. আল-কুর'আন, ১৮ঃ২৯

১৯. আল-কুর'আন, ৬০:৮-৯

২০. আল-কুর'আন, ৫:৫

২১. আল-কুর'আন, ৫:৪৩

২২. আল-কুর'আন, ৫:৪৭

২৩. আল-কুর'আন, ৬:১০৮

২৪. আল-কুর'আন, ২৯:৪৬

২৫. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, অধ্যায়: আল-খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ: ফী তাসীরি আহলিয-যিম্মাহ ইয়াখ-তালাফু বিত-তিজারাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০৫২, পৃ. ১৪৫৩

২৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০৫১, পৃ. ১৪৫৩

২৭. দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, এর প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মদীনার সনদ আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত এবং মুমিনগণ, কুরাইশ মুসলিমগণ, ইয়াসরিবের মুসলিমগণ এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ এবং তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সকলের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

মদীনার সনদের প্রধান শর্তাবলী হচ্ছে –

ক. মদীনার ইয়াহুদী, পৌত্তলিক, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সকলে একই জনগোষ্ঠী বলে গণ্য হবে এবং তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। তারা সকলেই সমান অধিকার লাভ করবে।

খ. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রধান হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি সর্বোচ্চ আদালতের সর্বময় কর্তা হবেন।

গ. সকল সম্প্রদায়ের লোকদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকলেই বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

ঘ. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলো মদীনার মর্যাদা রক্ষা করবে। মদীনা আক্রান্ত হলে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং তাদেরকে সন্ধি করতে আহবান করা হলে তারা যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং তা মেনে চলবে।

ঙ. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্ব-সম্মতি ব্যতিরেকে মদীনাবাসী কোন সম্প্রদায় কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

চ. কেউ কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করবে না।

ছ. ইয়াহূদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

জ. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলোর লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা হবে।

ঝ. এ সনদ যে বা যারা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। (বিস্ত ারিত দ্র. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৪০৪)

২৮. মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার,* লাহোর: ১৪১৫/১৯৯৫, পৃ. ৭-৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৮

৩১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,* আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, ঢাকা: মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯১

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. ইবনে আবেদীন, *দুররুল মুখতার,* প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

৩৬. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ,* অধ্যায়: আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ: ফাযলুল উলামা-ই ওয়াল হিসসি আলা তালাবিল ইলম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২৪, পৃ. ২৪৯১

৩৭. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার : একটি সমীক্ষা,* প্রাগুক্ত, বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ১৯৭-২২২

৩৮. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,* বাংলা অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪০-১০৫

৩৯. আল-কুরআন, ৩৩:৩৩

৪০. আল-কুরআন, ২:১৭৯

৪১. আল-কুরআন, ২:২১৯

৪২. আল-কুরআন, ৪:৪৩

৪৩. আল-কুরআন, ৫:৯০

৪৪. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৬৪১, পৃ. ৫০৩

৪৫. ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইস্তীআব,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮

৪৬. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল, আস-সিদ্দীক আবু বকর, মিসর: তা: বি:, পৃ. ২১০

৪৭. মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *নতুন শতাব্দীতে নুতন বিপ্লবের পদধ্বনি,* ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ১৭

৪৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সংশোধিত, ১৯৯৪, অনুচ্ছেদ: ৩, পৃ. ৫

৪৯. আল-কুরআন, ১৪:৪

৫০. আল-কুরআন, ৫:৩

৫১. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: আল-কদর, অনুচ্ছেদ: আন-নাহি আনিল কওলি বিল-কদর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২, পৃ. ৬১৭

৫২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ২৪

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯-৭২

# ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী

ইসলামী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো; তা সকল মানুষের মাঝে আদল, ইনসাফ ও সুবিচার কায়েমের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইসলাম সুবিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান ও সেনাবাহিনী প্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ একজন সৈনিককে জবাবদিহী করতে বাধ্য করে এবং কোন অপরাধ করলে বিধান মোতাবেক তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। সুবিচারের ক্ষেত্রে এখানে ছোট বড় ধনী গরীব রাজা-প্রজা কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকে না। এখানে বিচারকের কোন ক্ষমতা নেই বরং এখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা হলো আইনের। এমনকি এ আইন বিচারকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ যদি বিচারকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে তাহলে অন্য বিচারক তার বিচার করবে।

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার ভিত্তি তিনটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত

১. নিরপেক্ষতা ঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের কোন দলের পক্ষ অবলম্বনের কোন সুযোগ নেই বরং পক্ষপাতহীনভাবে ও শরীয়তের বিধান অনুসারে সকল মানুষের মাঝে সমানভাবে তাকে রায় ঘোষণা করতে হয়। বিচার ব্যবস্থার এ ভিত্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে 'আল্লাহ্ তার আমানত যথাস্থানে ও পাত্রে পৌছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।[১]

আল্লাহ বলেন ঃ 'আর তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করলে তা ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে করবে'।[২] অন্যত্র বলেন; হে মুমিনগণ তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক খবর রাখেন।[৩]

আল্লাহ বলেন ঃ হে মুমিনগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে তা তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ।[৪]

রাসূল স. বলেন ঃ মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল তা কুরাইশদের অত্যন্ত অস্থির করে তুলেছিল। তারা বললো, কে রাসূল স.-এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতিত আর কে এ নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? কারণ সে রাসূল স.-এর অত্যন্ত প্রিয়।

---

লেখক ঃ প্রফেসর, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

অতঃপর সে রাসূল স.-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহ থেকে এ দণ্ডের সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বকালের লোকদের নীতি ছিল যে, যখন কোন সম্রান্ত পরিবারের লোক চুরি করতো তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন অসহায় ব্যক্তি চুরি করত তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! আমার কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে তাহলে আমি মুহাম্মদ নিজেই তার হাত কেটে দিব।[৫] সুতরাং নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বিচারক তার পিতা-মাতা নিকট আত্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি কাউকেও ছাড় দিবে না।

দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ বিচারকের বিশেষ গুণ থাকতে হবে

বিচারকের দীনি জ্ঞান ও চারিত্রিক গুণ থাকতে হবে যে কারণে ফকীগণ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন; মুসলমান, বালেগ, স্বাধীন পুরুষ, ইজতিহাদ করার যোগ্যতা খোদাভীতি ও আমানতদার হতে হবে। এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিচারক নিয়োগ করা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি। আর স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার জন্য বিচারকের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। একটি আইন যতই ভাল হোক বিচারক যদি সুবিচারক না হন তাহলে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

'উয়ুনুল আখবার' গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন ইবনে সাবরামাকে কাজীর পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয় তখন ইয়ামনের গভর্নর তাকে বললেন; আপনি একজন লোকের নাম বলুন যাকে বিচারক নিয়োগ করা যায়। ইবনে সাবরামা বললেন; এমন কোন ব্যক্তির নাম আমার জানা নেই। তখন গভর্নর সানয়ার এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন এবং তাকে ডেকে পাঠান। সে উপস্থিত হলে ইবনে সাবরামা তাকে বললেন; তুমি কি জান কেন তোমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে; সে বলল, না। সাবরামা বলল, তোমাকে বিচারকের দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য ডাকা হয়েছে। সে বলল, বিচার করা একটি সহজ কাজ। তখন ইবনে সাবরামা তাকে বললেন, আমি তোমাকে সহজ একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, সে বলল করুন। ইবনে সাবরামা তাকে বললেন, এক ব্যক্তি গর্ভবতী একটি বকরীকে আঘাত করলে তার পেটের বাচ্চা বের হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তুমি কি রায় দিবে? একথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে যায় তখন ইবনে সাবরামা বললেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম বিচার সম্পর্কে তোমার কোন যোগ্যতা নেই। সে বলল; তাহলে তুমি বল এ ঘটনার বিচার কি হবে? ইবনে সাবরামা বললেন, গর্ভের বাচ্চার বয়স হিসাবে তাকে জরিমানা দিতে হবে।[৬]

তৃতীয় ঃ বিচারক স্বাধীন মুক্ত ও নির্ভয়ে বিচারের রায় ঘোষণা করবে। ব্যক্তি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার বিচারকের উপর নেই। সে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইজতেহাদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। মহানবী স. যখন মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের বিচারক নিযুক্ত করেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট মুকদ্দমা

পেশ করা হলে তুমি কিভাবে বিচার মিমাংসা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান না থাকে? মুয়ায বলেন রাসূলের স. সুন্নত অনুসারে বিচার করব, সুন্নাতে না থাকলে বুদ্ধির দ্বারা ইজতিহাদ করব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল তার বুকে হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসূলের স. প্রতিনিধিকে তাঁর মনঃপূত যোগ্যতা দান করেছেন।[৭]

### স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা মূলনীতি

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য একমাত্র নিরাপত্তা। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা না থাকলে রাষ্ট্রে ও সমাজে নিরাপত্তা থাকে না। আইনের প্রতি কারো শ্রদ্ধা থাকে না। ন্যায় বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা ও সমাজ জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকে না বরং নির্বাহী ও প্রশাসন বিভাগ বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। কোন কোন সময় নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করে বিচারকের কোন রায়কে বাতিল করে দেয়। এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হয়।

### বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মূলনীতি

(১) সাংবিধানিক সহযোগিতা, (২) দন্ডকার্যকরণে সহযোগিতা, (৩) জনগণের সহযোগিতা।[৮]

১। সাংবিধানিক সহযোগিতা ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে। কোন অবস্থায় উভয় বিভাগের কোন বিভাগ বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বরং তারা বিচার বিভাগের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে, যাতে বিচারক স্বাধীনভাবে বিচারের রায় কার্যকর করতে পারে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সর্বদাই স্বাধীন ছিল আর বিচারকগণ নিজের ক্ষমতা বলেই বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন শক্তিকে তারা ভয় করেননি। সত্য ও ইনসাফপূর্ণভাবে তারা সেভাবেই বিচারের রায় ঘোষণা করেছেন। ২০৪ হিজরীতে ইব্রাহীম বিন ইসহাক মিশরের প্রধান বিচারক ছিলেন। তার দরবারের দু'ব্যক্তির ঝগড়া বিবাদের একটি মোকদ্দমা পেশ করা হলো। তিনি তাদের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করলেন, সে ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধানের মাধ্যমে কাজীর কাছে সুপারিশ করার আবেদন করে।[৯] রাষ্ট্রপতি বিচারককে এ মামলা স্থগিত করার নির্দেশ দিলেন। তার নির্দেশ শুনে বিচারক কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে নিজ ঘরে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি বিচারকের বাসায় আসলেন এবং কর্মস্থল ত্যাগের বিষয় তার কাছে জানতে চান। বিচারক বললেন, আমি আর কোর্টে ফিরে যাবো না। মনে রাখবেন, বিচারের বিষয় সুপারিশ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই। তার কথা শুনে রাষ্ট্রপতি তার আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।[১০] বর্ণিত আছে যে হাবিব কুরাইশী নামক জনৈক ব্যক্তি বাদশাহ আবদুর রহমানের দরবারে প্রবেশ করে কাজী নসর ইবনে হারেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, আমি নাকি কোন এক ব্যক্তির ভূসম্পত্তি জোর পূর্বক দখল করেছি। বাদশাহ তার কথা শুনে ঘটনা যাচাই না করে কাজীকে এ রায় তাড়াতাড়ি কার্যকর না করার নির্দেশ দিলেন। কাজী এ সংবাদ শুনে সেদিনই রায় ঘোষণা

করে দিলেন এবং তার আদেশ বাস্তবায়ন করলেন। হাবিব এ সংবাদ শুনে বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে কাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, এভাবে কাজী আপনার কথা অবজ্ঞা করে রায় ঘোষণা করে আপনাকে অপমান করল। এটা কি মেনে নেবেন? তার কথা শুনে বাদশাহ কাজীর উপর ক্ষিপ্ত হলেন এবং বললেন, আমি তাকে অপেক্ষা করে রায় ঘোষণা করতে বলেছিলাম। অথচ সে আমার কথা না শুনে রায় ঘোষণা করল। অতঃপর বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে কাজীর দরবারে গেলে কাজী তাকে বললেন, আল্লাহ রাসূল স.-কে ন্যায় ও ইনসাফ করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে তার অনুসরণ করতে বলেছেন। আমরা যেন বিচার করার সময় আপন পর ধনী গরীব রাজা-প্রজা সকলের উপর ন্যায় বিচার করি। হে বাদশাহ! আপনাকে কে এ অধিকার দিয়েছে? আপনি প্রজাদের একজনের প্ররোচণায় অন্যের উপর প্ররোচিত হয়ে তার অধিকার খর্ব করছেন। তখন বাদশাহ বললেন, হে নসর ইবনে হারেস, আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।[১১]

৩। খলীফা মেহদীর মার সাথে আবু জাফর মনসুরের একবার ঝগড়া হয়, তারা উভয়েই মিশরের বিচারক গউস ইবনে সুলাইমানের নিকট বিচার দাবি করে। বিচারক খলীফা মনসুরের মায়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন।[১২]

দ্বিতীয় ঃ দন্ড সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করা

কাজীর কার্যক্রমে কেউ হস্তক্ষেপ করলে বিধান অনুসারে কাজী তাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ন্যায় বিচার ও জুলুম প্রতিরোধে কাজীকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে কাজী নির্বাহী ও প্রশাসনের যে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য এ দু'বিভাগের নিকট কাজী জবাব দিতে বাধ্য নয়। বরং উভয় বিভাগ কাজীর নিকট জবাব দিতে বাধ্য। বিশেষ করে কাজীর দায়িত্ব হলো ন্যায় বিচার করা ও জুলুম প্রতিরোধ করা। সুতরাং কাজীর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করলে কাজী তাকে বন্দি করতে পারে।

আব্বাসী যুগে মুসা কুফার আমির ছিলেন। বংশগত ও নির্বাহী প্রধান হিসাবে তার অগাধ ক্ষমতা ছিল। খলীফার বাড়ির পাশে তার ভাইয়ের একটি বাগান ছিল। সে বাগানের মালিক ছিল তার চাচাত ভাইগণ। তারা পাঁচ ভাই ও এক বোন ছিল। খলিফা বাগানের বোনের অংশ ছাড়া ভাইদের সকলের অংশ ক্রয় করে নেয় এবং বোনকে দিগুণ মূল্য দিয়ে তার অংশ ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে বিক্রি করতে অস্বীকার করে। একদিন খলিফা তার লোকজন দিয়ে মহিলার বাগানের দেয়াল উঠিয়ে দিয়ে তার বাগানের সাথে একীভূত করে ফেলে। অতঃপর মহিলা খলিফার নিকট নালিশ করে। কিন্তু খলিফা তার কথা কর্ণপাত না করে তাকে দিগুণ মূল্যে বিক্রি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। মহিলা বলল, না আমি তা বিক্রি করব না। আমার বাগান আমাকে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু খলিফা বাগান ফিরিয়ে দেয়নি। তখন মহিলা খলিফার বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তার বাড়ি গমন করে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে কাজী কোথায়? স্ত্রী উত্তরে বলেন, কাজী মসজিদে আছে। মহিলা কাজীর সাথে সাক্ষাৎ করে। কাজী তাকে জিজ্ঞেস

করলেন তোমার উপর কে জুলুম করেছে? সে বলল খলিফা মুসা ইবনে ইসা। কাজী বললেন ঘটনাটি বল। সে বিস্তারিতভাবে কাজীকে ঘটনাটি বলল। তখন কাজী একটি চিঠি লিখে তা সীলগালা করে মহিলার হাতে দিয়ে বলল, তুমি চিঠি নিয়ে খলিফার দরবারে যাবে এবং তাকে নিয়ে একত্রে উপস্থিত হবে। মহিলা খলিফার দরবারে প্রবেশ করতে চাইলে দারোয়ান তাকে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কি চাচ্ছ? সে বলল খলিফাকে চাচ্ছি। একথা বলার পরও সে মহিলাকে পুনরায় বাধা দিল। তখন মহিলা বলল, আমার নিকট কাজীর পক্ষ থেকে খলিফার উদ্দেশ্য লেখা একটি পত্র আছে তা তাকে পৌছিয়ে দাও। খলিফা পত্র পড়ে তার একজন পুলিশকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তুমি কাজীর নিকট গিয়ে বল, এভাবে একজন মহিলার কথায় খলিফার নিকট পত্র দেয়ার সাহস সে কোথায় পেল? পুলিশ চিঠি নিয়ে কাজীর দরবারে গেলে কাজী পুলিশকে জেলে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। এরপর খলিফা তার দারোয়ানকে পাঠালেন। কাজী দারোয়ানকেও জেলে পাঠালেন। পুনরায় কাজী কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সুপারিশ নিয়ে কাজীর দরবারে পাঠালেন। কাজী তাদের সকলকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা কাজীর এ কাজ মেনে নিতে পারেনি বরং খলিফা রাতের বেলা জেলখানা থেকে সকলকে মুক্ত করে দিলেন। এ খবর শুনে পরদিন কাজী তার গোলামকে বললেন, আমি কুফা থেকে বাগদাদ যাবো, তুমি আমার সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কাজী বাগদাদ পৌছলে লোকেরা খলিফাকে কাজীর আগমনের সংবাদ দিল। তখন খলিফা বের হয়ে আসলেন তারপর বললেন, কাজী সাহেব আপনি এভাবে লোকদের জেলে দিলেন। কাজী বললেন, তারা তোমার পক্ষ থেকে যেভাবে বিচারের কাজে সুপারিশ করার জন্য আমার নিকট গিয়েছে শরীয়তের বিধানমত তাদেরকে জেলখানায় প্রেরণ করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। শোন, তুমি যতক্ষণ পুনরায় তাদেরকে জেল খানায় ফেরৎ না পাঠাবে ততক্ষণ আমি বাগদাদ ছেড়ে যাবো না। অন্যথায় আমি তোমাকেও জেলে পাঠাবার নির্দেশ দিব। কারণ ন্যায় বিচারের দায়িত্ব পালনে আমাকে কাজী নিযুক্ত করা হয়েছে। তার কথা শুনে খলিফা কাজীর উপস্থিতিতে সকল বন্দীকে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দিলেন। কাজী যখন সকলকে জেলে পাঠাবার বিষয়টি নিশ্চিত হলেন, তখন তার গোলামকে বললেন খলিফার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে এজলাসে হাজির কর। তারপর মহিলাকে ডাকলেন এবং তাকে খলিফার পাশে বসালেন। তখন খলিফা বলল, আমি উপস্থিত হলাম এখন কি বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিবেন। কাজী বললেন, হ্যাঁ তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন কাজী তাদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। তারপর খলিফাকে বললেন, এ মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? খলিফা উত্তর দিলেন সে সত্য কথা বলেছে। কাজী বললেন, আপনি কি পুনরায় তার বাগানের দেয়াল তৈরি করে দিবেন খলিফা বললেন হ্যাঁ। তখন কাজী মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার আর কোন দাবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ বাগানে আমার মালির জিনিসপত্র খলিফার লোকজন নষ্ট করেছে তা ফেরত দিতে হবে। খলিফা বললেন তা ফেরত দেয়া হবে। কাজী বললেন, আর কোন দাবি আছে? মহিলা বলল না। তবে আমি দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তারপর কাজী খলিফার হাত ধরে উঠে পড়লেন এবং তাকে

বললেন খলিফা আপনাকে ধন্যবাদ আর কোন নির্দেশ দিব? খলিফা হেসে বললেন, আর কি নির্দেশ দিবেন। কাজী বললেন, এতক্ষণ যা করেছি কাজী হিসাবে শরীয়তের দায়িত্ব পালন করেছি। যার জন্য আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। আর আপনার সাথে আমার এ আচরণ এটা শিষ্টাচারের হক। এ ছিল ইসলামের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উদাহরণ। আজ কি তা খোঁজে পাওয়া যাবে।[১৩]

তৃতীয় ঃ জনগণের সহযোগিতা ঃ

জনগণের দায়িত্ব হলো বিচারকের সহযোগিতা করা। বিচার কার্যে কেউ যেন অন্যায় ভাবে হস্ত ক্ষেপ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মুসলমানের উপর এটি একটি ফরয কাজ। আর আল্লাহ মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম সর্বদা ন্যায় বিচারের স্বার্থে কাজীর পাশে দাঁড়াবার আদেশ দিয়েছে এবং ক্ষমতাসীন কোন ব্যক্তি বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করলে কাজীর সহযোগিতা করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো অন্যায় কাজে বাধা দেয়া।

কাজী আযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামের সাথে মিশরের তুর্কি শাসকদের মতবিরোধ দেখা দেয়। তুর্কি শাসকগণ বায়তুল মালের অর্থ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তখন আযুদ্দিন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে রায় দিলেন, তাদের ব্যবসার সকল সম্পদ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। বাদশাহ এ সংবাদ পেয়ে আযুদ্দিনের কাছে লোক পাঠালেন, তিনি যেন বাদশার দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি বাদশার কথা শুনেননি। যে কারণে বাদশাহ তার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। এ সংবাদ শুনে কাজী রাগান্বিত হলেন এবং যাবতীয় আসবাব পত্র একটি গাধায় আর পরিবার পরিজন অন্য একটি গাধায় আরোহন করিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। তিনি অর্ধেক পথ না যেতেই মিশরের হাজার হাজার নারী-পুরুষ বালক-বালিকা ব্যবসায়ী তার পিছনে রওয়ানা হলেন। যখন বাদশাহর কাছে সংবাদ পৌছানো হলো, তখন বাদশাহ চিন্তা করলেন আযুদ্দিন যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তার ক্ষমতাও চলে যাবে। বাদশাহ তাড়াতাড়ি নিজেই তার পিছনে রওয়ানা হলেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চাইলেন অতঃপর রাগ প্রশমিত করে তাকে পুনরায় বিচারালয়ে ফিরিয়ে আনলেন। আর কাজীর কাছে ওয়াদা করলেন বায়তুল মালের টাকা দিয়ে আর কখনও ব্যবসা করবেন না।[১৪]

**বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা**

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে সর্বদা বিচারক স্বাধীন থাকবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কয়েকটি নিশ্চয়তা ঃ

১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গ্যারান্টি ঃ

ইসলামের বিধান মতে বিচার বিভাগ সব সময় স্বাধীন থাকবে এবং একদল অভিজ্ঞ বিচারক দ্বারা এ বিভাগ পরিচালিত হবে যাদের আইন ও বিচার সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা বিচারকের বৈশিষ্ট্য যাচাই করে বিচারক নিয়োগের প্রস্তাব করবে এবং নির্বাহী ও প্রশাসনের হস্ত ক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।[১৫] রাসূল স. ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে

বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি ইতাব ইবনে আসাদকে মক্কা, আলী রা. ও মুয়াব ইবনে যাবাল রহ.-কে ইয়ামনে বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি নিজে কাজীর নিয়োগ ও বেতন ধার্য করে দিতেন। তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলিফা কাজী নিযুক্ত করতেন এবং নিজেই এ বিভাগের দেখাশুনা ও তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতেন। এমনকি খলিফা নিজে কাজীর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকতেন। উমর রা. খলিফার নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করে দেন। উমাইয়া ও আব্বাসীদের যুগে এ ধারাবাহিকতা বিরাজমান ছিল। পরবর্তীতে ওসমানীদের যুগেও কোন কোন দেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল।[১৬]

**২. বিচারকের স্বাধীন মত প্রকাশ করার নিশ্চয়তা**

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হলো বিচারকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা। তাকে ব্যক্তি দল ও রাষ্ট্র ক্ষমতার ভয় থেকে মুক্ত থেকে বিচারক হিসাবে রায় দেয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। তার উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রশাসনের থাকবে না। সে জন্য ইসলাম বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ হিসাবে এবং এ পদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ মনে করে। যে কারণে এ পদের প্রার্থী হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ পদের প্রার্থী হয় তাকে নিয়োগদান করা ইসলাম হারাম মনে করে।

আবু মুসা আশয়ারী র. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথে এক ব্যক্তি রাসূলের স. নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তাদের দুজনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল স. আমাকে কোন পদে নিযুক্ত করুন। অপর ব্যক্তিও অনুরূপ কথা বলল। রাসূল স. বললেন; যে ব্যক্তি এভাবে পদ চায় এবং পদের প্রতি লালায়িত হয়, আমি তাকে কোন পদে নিযুক্ত করি না।[১৭]

ইসলাম কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে কাজীর পদে নিয়োগ দানে সতর্ক করে দিয়েছে এবং এটাকে খেয়ানত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এক ধরনের প্রতারণা মনে করে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্বে নিযুক্ত থাকে আর সে যদি জেনে শুনে যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন পদে নিযুক্ত করে তাহলে সে আল্লাহ তার রাসূল স. ও মুসলমানদের সাথে খেয়ানত করে।[১৮]

**৩. কাজীর স্থায়ী নিয়োগ দানের নিশ্চয়তা**

কাজীর পদ ও তার চাকুরীর নিশ্চয়তা থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রের বা প্রশাসনের কোন পক্ষের নিকট তাকে জবাবদিহি করতে না হয় সে ব্যবস্থা থাকবে। যে কোন কারণে কাজীকে বদলী পদচ্যুত ও তার বিচার কাজ বন্ধ করা যাবে না। তবে সে যদি এমন কোন অপরাধ করে তাহলে তাকে বদলী ও পদচ্যুত করা যাবে। কিন্তু তা করবে নির্দিষ্ট বিচার বিভাগ। নির্বাহী ও প্রশাসনের কোন বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

আবূ ইয়ালী বলেন, যতক্ষণ কাজী বিচারকের শর্তসমূহের মধ্যে অবস্থান করেন ততক্ষণ তাকে পদচ্যুত করা যাবে না। এটা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত, সুতরাং এককভাবে নির্বাহী বিভাগের এখানে কোন ক্ষমতা নেই।[১৯]

### ৪. কাজীর নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার জন্য কাজী বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। আব্বাসী যুগে তাওবা ইবনে নাওমারকে যখন কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়; তিনি প্রথমে নিকট আত্মীয় ও আপন জনদেরকে তার বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ হে মুহাম্মদের মা। তুমি সবচেয়ে উত্তম সাথী কাকে চাও। স্ত্রী বললেন, তুমিই তো আমার উত্তম সাথী। তখন তাওবা ইবনে নাওমার বললেন ঃ তাহলে শোন, তুমি আমার বিচারের কোন ব্যাপারে আমার নিকট কোনও সুপারিশ উপস্থাপন করবে না। কোন অভিযোগকারীর বিষয়ে আমাকে কোন সুপারিশ করবে না এবং কি রায় দিব এ ব্যাপারে কখনও প্রশ্ন করবে না। তুমি যদি এসব বিষয়ে আমাকে কোন প্রশ্ন কর তাহলে তুমি তালাক। এখন তুমি চিন্তা কর সম্মানের সাথে আমার সাথে থাকতে চাও না নিন্দনীয় হয়ে বিদায় নিতে চাও। ন্যায় বিচারের স্বার্থে একজন বিচারক তার স্ত্রীকে এভাবে সতর্ক করে দিলেন। স্ত্রী ও স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। স্ত্রী বলেন ঃ যতদিন তিনি কাজী ছিলেন আমি কোনদিন তার কাছে তার বিচারের কোন বিষয়ে জানতে চাইনি। এটা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[২০]

১। নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে কাজী তার স্ত্রীর পক্ষে বিচারের রায় প্রদান করতে পারবে না।

২। নিজের ভাই বোনের বিচার করতে পারবে না।

৩। কাজীর সাথে বৈষয়িক কোন বিষয় কারও কোন শত্রুতা থাকলে তার বিচার করতে পারবে না।

৪। কাজীর সাথে কোন কাজে কেউ শরীক থাকলে কাজী তার বিচার করতে পারবে না।

৫। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেতন নেওয়ার পর কাজী অন্য কোন ব্যবসা করতে পারবে না।[২১]

### ইসলামে বিচার ব্যবস্থার বাহ্যিকরূপ

১। কাজীর নিয়োগ ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজী নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন ও মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। কাজীর পদটি ব্যক্তিগত পদমর্যাদা ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পদ নয়। এ পদের দায়িত্ব পালন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তির উপায়। যে কারণে কাজী নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শর্তগুলো পূরণ করে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজীর পদটি সম্পদ লাভের পদ নয় বরং লোকসানের পদ। আব্বাসীয় খলিফা তার উজির মুহাম্মদ ইবনে মাসলামকে কাজী আবূ ইয়ালীর (৪৫৮) নিকট কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। কাজী এ পদ গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু খলিফা তার কথা শুনলেন না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন তিনি। যে কারণে তিনি তাকে অনুরোধ করলেন। খলিফার অনুরোধে তিনি শর্ত সাপেক্ষে কাজীর পদ গ্রহণ করলেন। শর্তগুলো ছিল-

১। খলিফার সাথে একত্রে কোথাও গমন করবেন না।

২। খলিফার অভ্যর্থনায় তিনি বের হবেন না।

৩। রাজ দরবারে কখনও গমন করবেন না।
৪। প্রতি মাসে দুদিন বিচারালয়ে উপস্থিত থাকবেন না। দুদিন ছুটিতে থাকবেন।
তার এসব শর্ত মেনে খলিফা তাকে কাজীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।[২২]
আব্বাসীয় খলিফা মতিউল্লাহ আবুল হাসান মুহাম্মদ শায়রানীকে কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে রাযী হন। শর্তগুলো ছিল ঃ
১। কাজীর পদে থেকে তিনি কোন বেতন নিবেন না।
২। খলিফা তার ইচ্ছেমত তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না।
৩। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে তার কাছে কোন সুপারিশ করা যাবে না।[২৩]
দ্বিতীয় ঃ কাজীর হুকুম রাষ্ট্র প্রধানের জন্য প্রযোজ্য এমনকি তার নির্দেশে রাষ্ট্র প্রধান কাজীর দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য। রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে কোন রায় ঘোষণা করলে সে তা মানতে বাধ্য। খেলাফতে রাশেদার যুগে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার এ বিধান কার্যকরী ছিল। যেমন আলী রা.-এর বর্ম হারানোর ঘটনা। একবার আলী রা. এর বর্মটি হারিয়ে যায়। একজন খৃস্টান তা কুড়িয়ে পায়। আলী রা. তার হাতে বর্মটি দেখে কাজী শুরাইহ্-এর দরবারে বিচার দেন। কাজী খৃস্টানকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো বর্মটি আমার। আলী মিথ্যা বলেছেন। কাজী শুরাইহ্ আলী র.-কে সাক্ষী উপস্থিত করতে বললেন। আলী বললেন; আমার কোন সাক্ষী নেই। তখন কাজী খৃস্টানের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। এতে খৃস্টান ব্যক্তি এমনভাবে প্রভাবিত হলো, যে সে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর সে বললো, বর্মটি আলীর। সিফফিনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে এটি তার বাহন থেকে পড়ে যায় তখন আমি উহা কুড়িয়ে পাই। তার কথা শুনে আলী র. বর্মটি তাকে দান করে দিলেন।[২৪]
একবার উমর রা. এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়া পরিবহনের জন্য ধার নিয়েছিলেন। পরিবহনের সময় ঘোড়াটির ক্ষতি হয়। ঘোড়াটি যখন তার মালিককে ফেরৎ দিচ্ছিলেন, তখন মালিক বললো তোমাকে আমি সুস্থ ঘোড়া ধার দিয়েছি। আর তুমি ঘোড়াটির ক্ষতি সাধন করে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছ। তখন উমর রা. বললেন; চলো আমরা কাজীর কাছে গিয়ে এর ফয়সালা করি। সে ব্যক্তি বলল, চল। কাজী শুরাইহ্-এর নিকট গিয়ে উভয়েই বিচার প্রার্থী হলেন। কাজী উভয়ের কথা শুনে বললেন; হে আমিরুল মুমেনিন, আপনি সুস্থ ঘোড়া নিয়েছেন। সুতরাং ক্ষতিপূরণ দিয়ে যে অবস্থায় গ্রহণ করেছেন সে অবস্থায় ফেরৎ দিন। তখন উমর রা. বললেন; এভাবেই কি আপনি বিচার করেন। আপনি কুফায় চলুন আপনাকে সেখানে কাজী নিয়োগ করা হবে। কাজী শুরাইহ্ ৬০ বছর কুফার কাজী ছিলেন। খলিফার সম্মুখে কাজী রায় প্রকাশ করতে কোন ইতস্তঃ করলেন না। রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে কাজী ছিলেন স্বাধীন। উমর রা.ও কাজীর উপর রাগ করেননি। কারণ উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।[২৫]
আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনকালে খায়র ইবনে নয়ীম কাজী ছিলেন। মারওয়ানের সাথে তার চাচাত ভাইয়ের ঝগড়া হয়। উভয়ে এসে কাজীর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করে।

আবদুল মালেক তার নিজের বিছানো চাদরে বসা ছিলেন। তখন কাজী তাকে বললেন; আপনি উঠে গিয়ে আপনার চাচাত ভাইয়ের পাশে বসুন। বাধ্য হয়ে আবদুল মালেক কাজীর নির্দেশ মত তার পাশে গিয়ে বসলেন।[২৬] ইসলামী বিচারে বাদী বিবাদীকে একই স্থানে বসানো হতো। কোর্টে খলিফা হিসাবে বাদী বা বিবাদীর কোন বিশেষ মর্যাদা ছিল না।

### ৩। কাজীর সচেতনতা

কাজীকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে যাতে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান তার বিচারের রায়ে কোনভাবেই প্রভাব খাটাতে না পারে। কারণ নির্বাহী প্রধান বিচার বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করলে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা খর্ব হয়। ইয়াহইয়া ইবনে বকর বলেন, আবদুল মালেক ইবনে ইয়াযিদের শাসনকালে একজন সৈনিক অন্য একজন সৈনিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়। তখন সে কাজী খায়েরের নিকট অভিযোগ দেয় এবং তার পক্ষে একজন সাক্ষীদাতাকে হাজির করে। কাজী অভিযুক্ত সৈন্যকে বন্দী করার নির্দেশ দেন এবং তাকে অন্য আর একজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলেন। এ সংবাদ শুনে আবদুল মালেক সৈন্যকে বন্দী থেকে মুক্তি দেন। আবুদল মালেকের এ আচরণে কাজী কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং বিচার কার্য থেকে বিরত থাকেন। তখন আবদুল মালেক তার কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমি এখনই সৈনিককে বন্দীশালায় ফেরত পাঠাচ্ছি। কাজীর প্রতিবাদে নির্বাহী প্রধান কাজীর নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হলেন।[২৭]

### ৪. কাজীর রায় বাস্তবায়ন

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কাজী তার রায় ঘোষণায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান সকলের উপর সমানভাবে তার হুকুম জারি করতে পারে।

### ৫. কাজীর রায়ে হস্তক্ষেপ

ইসলাম কোন ব্যক্তিকে কাজীর রায়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না বরং ন্যায় বিচারের স্বার্থে কাজী কোন ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণ ও বর্জন করতে পারে। কাজীর কাছে যদি কোন সাক্ষী গ্রহণযোগ্য মনে না হয় তাহলে সে দেশের নির্বাহী প্রধান হলেও কাজী তার সাক্ষী বর্জন করতে পারে। এমনকি তিনি কাজীর নিয়োগ দান করলেও খলিফা কাজীকে কোন বিষয় পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু আদেশ দিতে পারেন না।[২৮] কাজী তার পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

কাজী মুহাম্মদ ইবনে বশির স্পেনের বাদশার সাক্ষী প্রত্যাখ্যান করেন। কাজী যখন দেখলেন বাদীর পক্ষে বাদশাহ সীলগালা করে একটি চিঠিতে সাক্ষ্য পাঠিয়েছে তখন তিনি বললেন, এ ধরনের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করি না। তুমি সত্য সাক্ষ্য উপস্থিতি কর। তার কথা শুনে বাদশার উকিল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বাদশার নিকট ফিরে এসে বললো; তোমার ক্ষমতা ও মান সম্মান সবই শেষ। কাজী তোমার সাক্ষী প্রত্যাখ্যান করেছে। তুমি হলে দেশের বাদশাহ আর কাজী নিয়োগ করার ক্ষমতা তোমার হাতে অথচ সে তোমার পাঠানো সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং তাকে বরখাস্ত করা উচিত। বাদশাহ তাকে বললেন, তুমি কি মনে করছ আমি এ কাজ করবো? শোন, কাজী একজন সৎ লোক। সে কারও সমালোচনা ও রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। তাকে গিয়ে

বল তার উপর যে দায়িত্ব সে তা সঠিকভাবে পালন করতে এবং সুপারিশের সকল পথ বন্ধ করতে। আমি তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমি কাজীর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাই না।[২৯]

**৬. কাজীর সাথে বিতর্ক করার স্বাধীনতা**

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের শাসনকালে মিশরের কাজী ছিলেন নওবা ইবনে নুমাইর হাদরামী। তিনি একবার সিদ্ধান্ত নিলেন অপব্যয়কারীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপে করবেন অথচ তিনি নিজেই তার মালের অপচয় করতেন। তার ভাইগণ তার জন্য যে সম্পদ পাঠাতো সেটাই ছিল তার মাল। তা ছাড়া তার নিজের কোন সম্পদ ছিল না। তার গোলাম হুমাইর অভিযোগ করলো, তোমার সম্পদের কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তুমি সবই খরচ করে ফেলেছ। তখন নওবা বললো, আমি চাচ্ছি তোমাকে অপচয় থেকে ভাবতে হলে বর্তমান খরচের বেয়ে দশ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম হলেও আমাদের সবার জরুরি প্রয়োজন নির্বাহ হবে। তার কথা শুনে কাজী অবাক হলেন এবং বললেন, আমি গোলামের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলাম। এভাবে ইসলাম কাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অবকাশ রেখেছে।[৩০]

**৭. কাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন**

খলিফা ও আমিরগণ সব সময় কাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাদের প্রয়োজন পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে বেতন নির্ধারণ করতেন। যাতে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক চিন্তা করতে না হয়। এটা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কাজীর প্রতি সহযোগিতা।

উমর রা. মায়ায ইবনে যাবাল ও আবু ওবায়দা আমর ইবনে জাররাহকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, তোমরা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে কাজী নিযুক্ত করে বায়তুল মাল থেকে তাদের জন্য উত্তম বেতনের ব্যবস্থা করবে।[৩১]

কোন কোন ফকীহ বলেন, কাজী ধনী লোক হবে। যদি না হয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার প্রয়োজন অনুসারে সম্মানির ব্যবস্থা করবে এবং তার কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবে।[৩২]

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ছোট বড়, শক্তিশালী, দুর্বল রাজা প্রজা সকলের জান মাল ও ইজ্জতের অধিকার সমান। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য যেভাবে দুর্বল ও প্রজাদের শাস্তি দেয়া হয় সেভাবে শাসক ও কর্মচারীদেরকেও শাস্তি দেয়া হয়। শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মাঝে জীবন ধারণ পার্থক্য হতে পারে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

নির্বাহী প্রধানের উপর কাজীর অধিকার সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ বলেন, প্রধান কাজী খলিফা ও তার কর্মচারী এবং অন্য কাজীদের মোকদ্দমার শুনানি করে রায় দেবেন।

কাযিখান বলেন, যে আমির কাজী নিয়োগ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে তার বিচার করা কাজীর জন্য বৈধ। তেমনি প্রধান বিচারপতি তার নিচের বিচারপতিদের মোকদ্দমার ফয়সালা করবেন কোন কোন সময় নিম্ন কোর্টের বিচারকও উচ্চ আদালতের বিচারকের মোকদ্দমা ফয়সালা করতে পারবে।[৩৩]

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও একক ক্ষমতার ব্যাপারে আবু হানিফার মত হলো, কাজীর হুকুম খলিফার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কাজী খলিফা ও তার কর্মচারীদের রায় ঘোষণা করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কাজীর পদ ছেড়ে দিতে হবে। উমাইয়া ও আব্বাসীদের যুগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যায়। তখন রাষ্ট্রের কর্মচারীদের উপর কোন রায় কার্যকর করা বড়ই কঠিন কাজ ছিল। যে কারণে আবু হানিফা কাজীর পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। প্রথমে উমাইয়াদের যুগে ইরাকের গভর্নর ইয়াযিদ ইবনে ওমর ইবনে হাবিরা আবু হানিফাকে কাজীর পদ গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে আবু হানিফাকে দৈনিক বিশটি বেত্রাঘাত করা হতো। তা সত্ত্বেও তিনি এপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

আব্বাসী যুগে খলিফা মনসুর আবু হানিফাকে প্রধান কাজীর পদে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রস্তাব পাঠান কিন্তু আবু হানিফা স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যদি খুশী হয়ে এ পদ গ্রহণ করি তাহলেও আপনি বলবেন আমি বাধ্য হয়ে এ পদ গ্রহণ করেছি। যদি কোন বিচারের রায় আপনার বিরুদ্ধে যায় এবং আপনি আমাকে ধমক দেন অথবা কোন রায় পরিবর্তনের জন্য বলেন আর আপনার আদেশ পালন না করার কারণে আমাকে ফুরাত নদীতে ডুবিয়ে মারবেন। বস্তুত আমি ডুবে মরতে রাযি থাকবো তারপরও আমার রায় পরিবর্তন করবো না। আপনার দরবারে এমন ব্যক্তিরা কাজী হতে ইচ্ছুক যারা আপনার ইচ্ছেমত রায় প্রদান করবে সে হিসাবে আমি আপনার নিকট উপযুক্ত ব্যক্তি নই।

ইমাম আবু ইউসুফ এ প্রেক্ষিতে চিন্তা করলেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাজীর পদ গ্রহণ করা উচিত। খলিফা মেহদী (১৬৬ হিঃ) আবু ইউসুফকে পূর্ব বাগদাদে কাজী নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুনুর রশীদের উপর তার প্রভাব পড়ে খলিফা তাকে আব্বাসী রাষ্ট্রের প্রধান কাজী নিয়োগ করে দেশের বিচার ব্যবস্থা তার হাতে ছেড়ে দেন। তার বিচারের সময় আলেমদের একটি দল উপস্থিত থাকতেন। যাদের মধ্যে ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলও ছিলেন। তার সময়ে তিনি হারুনুর রশীদের নিকট বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি পত্র লিখেন। তাতে লেখা ছিল, ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপনাকে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও সুপারিশের পথ বন্ধ করতে হবে এবং কোন ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি কোন ভাবেই তাকানো যাবে না। হারুনুর রশীদের যুগে এক খৃস্টান ব্যক্তি খলিফার বিরুদ্ধে একটি বাগানের ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করে। কাজী খলিফার বক্তব্য শুনেন এবং তাকে তিনবার হলফ করতে বলেন। যখন খলিফা হলফ করতে অস্বীকার করেন, তখন কাজী খৃস্টানের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অনুশোচনা করে ছিলেন কেন আমি খলিফাকে খৃস্টানের সাথে কোর্টে একত্রে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইনি। সে সময় বাদী বিবাদীকে একই কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হতো। কাশিম ইবনে আরাপী বলেন; আমি নিজে কাজী ইউসুফকে মৃত্যুর সময় বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ না করে নগণ্য হিসাবে মৃত্যু বরণ

করলেই ভাল হতো। তবে আমি আল্লাহর শুকর করছি সরকারী লোক হোক অথবা সাধারণ মানুষ কারও উপর ইচ্ছে করে আমি জুলুম করিনি। মোকদ্দমায় কোন পক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিনি।[৩৪] পূর্বযুগে খলিফাগণ কখনও কাজীর বিচারে হস্তক্ষেপ করতেন না। তারা এটাকে জুলুম মনে করতেন। যে কারণে কাজী সব সময় স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। তাতে জনগণ রাষ্ট্র ও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। ইচ্ছে করে কেউ আইন ভঙ্গ করতো না, সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকতো। মানুষ নিরাপদে বসবাস করতো। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার জন্য প্রথমে প্রয়োজন যোগ্য খোদা ভীরু লোকদের কাজী নিয়োগ করা এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া। বিচার ব্যবস্থায় এ দুটো শর্ত পূরণ না করলে সমাজে সত্যিকার ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। আজ আমাদের বিচার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে আমরা কি দেখতে পাই। বাস্তবে কি বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হতে পেরেছে? কাগজে-কলমে স্বাধীনতার কথা বলা হলেও ক্ষমতাসীনরা তাদের ইচ্ছেমত যে কোন উপায়ে বিচারকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারককে সরকারের ইচ্ছেমত রায় প্রদান করতে বাধ্য করে। এ ধরনের বিচার ব্যবস্থায় যতই স্বাধীনতার কথা বলা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এ স্বাধীনতা কাগজে-কলমেই।

### গ্রন্থপঞ্জি


১। সূরা নিসা ঃ ৫৮

২। আরাফ ঃ ২৯

৩। সূরা নিসা ঃ ১৩৫

৪। সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

৫। সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৮২, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭৭।

৬। মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনুরী, উয়ুনুল আখবার, হাইয়াতুল মিশরী, ১৯৭৩, খন্ড ১ পৃঃ ৬৪

৭। সুনানে তিরমিযি, অনুচ্ছেদ, মা জাআ ফিল কাযি, পৃ. ১৬

৮। সাইয়েদ ফারুক কায়লানী, ইসতেকলাল আল-কাযা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭ মিশর ঃ দারুত তালিকা পৃ. ৪২

৯। শেখ মাহমুদ আরনুস, আল-কাযা ফিল ইসলাম, মহাদারা জামেয়া আজহার, ১৯৮৫।

১০। আবদুল কাদের আওদাহ, আল ইসলাম অ-আওদা'না আস-সিয়াসা, বৈরুত, মুয়াসাসা আর-রেসালা, ১৯৮১ পৃ. ৭০

১১। তারিখ কাযায়ে আন্দালুস, ফিমান ইসতাহিকু কাযা ও ফতোয়া, বৈরুত, মাকতাবা তেজারী ১৯৯০ পৃ. ৪৪

১২। শেখ মাহমুদ আরনুস মুযাক্কারা ফি তারিখুল কাযা। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, কুল্লিয়া শরীয়া জামেয়া আজহার ১৯৮০

১৩। পূর্বোক্ত পৃ. ২৩৬
১৪। আস-সবকী, তাবাকাতুস শাফেয়ীয়া, আল কুবরা, মিশর, বাবী আল হালবী, ১ম সংস্করণ, খন্ড, ৮ পৃ. ২১৭
১৫। সেখ মাহমুদ আরনুস, পূর্বোক্ত ঃ ২১৯
১৬। আলকিন্দি, সুবহে আয়াসা, কায়রো, মাকতাবা আমিরী, ১৯১৪, খন্ড, ৩ পৃ. ৪৮৬
১৭। সহীহ মুসলিম, কাযা অধ্যায়,
১৮। তাবরানী, আল আওসাত গ্রন্থ, বৈরুত ঃ দারুস সালাম ১৯৮০, পৃ. ২১২
১৯। আবু ইয়ালী, ফারায়া, আহকামুস সুলতানীয়া, পৃ. ৬৫
২০। ড. কামাল মুহাম্মদ ইসা আবফীয়া ও কাযা ফি বেহালিল ইসলাম
২১। আবদুল কাদের আবু ফারেস, আল কাযা ফিল ইসলাম, জর্ডান, মাকতাবা আকাসা, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ২০৬
২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
২৩। সয়ুতী, তারিখুল খুলাফা, মিশর, মাকতাবা আমিরী, ১৯৮৫, পৃ. ৩৬
২৪। পূর্বোক্ত পৃ. ৭৫
২৫। আহকামুস সুলতানিয়া, মোঃ হাবীব আল বসরী, ২য় সংস্করণ ১৯৬৬, মিশর ঃ মুস্তফা হালাবী পৃ. ১২৬
২৬। ইউসুফ আল-কিন্দি, আলওয়ালাত আল কাযা, মিশর ঃ মুয়াসসাসা খানাজী, ১৯০৭ পৃ. ৩৫৬
২৭। পূর্বোক্ত পৃ. ৬৫
২৮। মুযাককারাতু ফি তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃ. ৬৩
২৯। তারিকুল কাযা আন্দালুস পৃ. ৭৯
৩০। তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম পৃ. ৬৩
৩১। মুহাম্মদ সালিম, মানার আস সাবিল, বৈরুত, দারুস সালাম ১৩৭৮, খন্ড ২ পৃ. ৪৪৭
৩২। ইবনে জৌযী গারনাতী মালেকি, কাওয়ানীন আল-আহকাম আস শরীয়া, বৈরুত, দারুল মালাইন, পৃ. ২২৩
৩৩। ফতুয়া আলমগীরী ভারত, আলীগড় লাইব্রেরী, খণ্ড, ২ পৃ. ৪৪৭
৩৪। খতিব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, খণ্ড ১৪ পৃ. ২৫২

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা : ৭৩-৯০

# ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : কর্মক্ষেত্র ও কিছু প্রস্তাবনা

মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা

অসীম দয়ালু ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এই পৃথিবীকে বিপুল নিয়ামতরাজি দ্বারা পূর্ণ করেছেন। আল-কুরআনের পাতায় পাতায় তার ধারাবর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষকে তিনি পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব হলো, মানবমন্ডলী তাঁর হেদায়েত অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশৃংখল, সুখী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত রাখবে। মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের মধ্যেই রয়েছে ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক সুবিচারের মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য বিমোচনের ইশারা। প্রতিটি মানুষের জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদরাজির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আল্লাহর নবী-রসূলগণও এ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর রসূল স.-এর মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন কঠিন দুরবস্থা ছাড়া ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হারাম। অর্থাৎ আল্লাহ চান মানুষ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করুক।

কিন্তু এর সাথে সাথেই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে দারিদ্র্যসহ নানা প্রকার সমস্যা দ্বারা মানুষের সহনশীলতার পরীক্ষা নেয়া হবে। সম্পদ ও নানা প্রকার নিয়ামতের বিপুলতাও মহাপরীক্ষা। সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর দয়াপ্রাপ্তিকে অভাবীদের অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের বহুস্থলে নানা আঙ্গিকে দারিদ্র্য প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত হয়েছে। তার সাথে সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণের সুস্পষ্ট পদ্ধতিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

## দারিদ্র্য বলতে যা বোঝায়

দারিদ্র্য বলতে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থাভাবকে বোঝায় যে কারণে মানুষ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারে না। সাধারণভাবে খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদিকে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। তবে মৌলিক প্রয়োজনসমূহ স্থান, সময়, ব্যক্তি ও পরিবেশ ভেদে কিছুটা পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্তিত হয়। এ কারণে দারিদ্র্যের সংগা নির্ধারণে গবেষকদের বর্ণনায়ও কিছুটা পার্থক্য সূচিত হয়েছে। একেকজন একেকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকে সামগ্রিকতার আলোকেও সংগা প্রদান করেছেন। তিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক সামাজিক ও মানসিক উপোস।[১]

---

লেখক ঃ ঢাকার একটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রভাষক।

সুবাই রাউনট্রি বলেন, দারিদ্র্য হলো স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনে অপ্রতুল।[২]

ইমাম শাতবী ও ইমাম গাযালী মৌলিক প্রয়োজনগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে[৩] উপস্থাপন করেছেন :

১. আকীদা ঃ দীন-ঈমান, আদর্শ।

২. নফস ঃ অন্ন, বস্ত্র, আবাসস্থল, চিকিৎসা, ভালো পরিবেশ, যানবাহন, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি।

৩. নসল ঃ পরিবার গঠনের ক্ষমতা।

৪. আকল ঃ শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫. মাল ঃ ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ।

৬. হুররীয়াত ঃ স্বাধীনতা।

তবে অর্থনীতিবিদদের এ সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো একটি অপরটির পরিপূরক। তাতে মৌলিক পার্থক্য তেমন নেই বললেই চলে।

সাধারণভাবে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবকেই প্রধান অভাব ধরা হয়। এটা সবার ক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য। অন্যগুলো ব্যক্তিভেদে পরিবর্তনশীল। যেমন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন মেধাবীর জন্ম হলো। সে তার উচ্চমানের মেধার বিকাশ ও ব্যবহারের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে পারল না। দক্ষতা উন্নয়নের বিবেচনায় সে অবশ্যই দরিদ্র। এক্ষেত্রে তার জন্য সুবাই রাউনট্রির দারিদ্র্য সংক্রান্ত সংগা প্রযোজ্য (উপরে বলা হয়েছে)। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি অবশ্যই দরিদ্র নয়।

## দারিদ্র্য, সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

কোন সমস্যার সমাধান বা কোন বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে ইসলাম শুরুতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দেয়। ডাক্তারগণ যে কোন অঙ্গের চিকিৎসার সময় যেমন শরীরের সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন, ইসলামের ভূমিকাও সেরূপ।

আল্লাহর দাসত্ব পরিহার করে বিভিন্ন যুগে মানুষেরা কোন কোন সমস্যার সামাধান করতে গিয়ে অজস্র সমস্যার উৎপত্তি ঘটিয়েছে। আবার কোন কোন বিষয়ে উন্নতি করতে গিয়ে অজস্র উন্নতির পথকে রুদ্ধ করেছে। কিন্তু ইসলাম মানুষের সার্বিক বা সুষম উন্নতির পথ দেখায়। তাই ইসলাম হলো দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান নির্ধারণের জীবনাদর্শ।

বস্তুবাদী জীবন দর্শন বা বস্তুবাদ প্রভাবিত অর্থব্যবস্থায় দারিদ্র্যকে অভিশাপ ও মানুষের এক নম্বর দুর্দশা বলে উপস্থাপন করা হয়। সুদভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থার বাহকবৃন্দ দারিদ্র্যকেই অশান্তি, অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অরাজকতার প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেন। তাঁরা আর্থিক উন্নতির ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করেন।

বস্তুবাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সেকেলে। আল-কুরআনে এর যথেষ্ট আলোচনা আছে। অতীতে শিরকভিত্তিক জাহেলিয়াতের বাহকবৃন্দ আল্লাহর নবীদেরকে এ কথা বলে যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে, দেবতাগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলেই তারা স্বচ্ছন্দ ও চোখ ধাঁধানো জীবন উপভোগ করছেন।

আর নবীদের পথ ভ্রান্ত বলেই নবী ও তার অনুসারীরা নানা মুসীবতে জর্জরিত। তারা বলতো, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব? অথচ তোমার অনুসরণ করছে নিকৃষ্টতম লোকেরা।[৪]

হাজার বছরের সংগ্রামী নেতা হযরত নূহ আ.-এর অধিকাংশ অনুসারী দরিদ্র, দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই মুশরিক নেতৃবৃন্দ উপরের কথাগুলো বলেছিল।

আল্লাহ্ আরো বলেন, 'ওরা সর্বদাই একথা বলতো যে, আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী। আমরা কিছুতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।'[৫]

অর্থাৎ দেবাতগণ খুশি হয়েই তাদের জন্য সমৃদ্ধি ঢেলে দিয়েছে বলে তারা মনে করতো।

বর্তমান জাহেলীয়াত অতীতের শিরকভিত্তিক জাহেলীয়াতের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জীবন সম্পর্কে একই মূল্যবোধের ধারক। অর্থাৎ বস্তুকেন্দ্রিক। আর তার পরিণতি হলো বিপর্যয় ও অরাজকতা।

কুরআন-হাদীসে বহু স্থানে অতি আকর্ষণীয়ভাবে দারিদ্র্য সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত হয়েছে। কিছু ডকুমেন্টস্ নিম্নরূপ :

১. 'তিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, কারো চেয়ে কারো মর্যাদা উন্নত করেছেন (বিভিন্ন বিষয়ে)। এর উদ্দেশ্য হলো তিনি যা দিয়েছেন সে বিষয়ে পরীক্ষা করা।[৬]

২. আমরা দুনিয়াতে তাদের মধ্যে জীবিকা সামগ্রী বন্টন করি এবং কারো চেয়ে কারো মর্যাদা উন্নত করি, যাতে তারা একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করতে পারে।[৭]

৩. কাফেরদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেছেন, '(হে নবী) বল; আমার রব যাকে ইচ্ছা রিযিকে সমৃদ্ধি দেন আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণতা দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে অজ্ঞ।[৮]

   'তাফহীমুল কুরআনে' উপস্থাপিত এ আয়াতের তাফসীরের সারাংশ নিম্নরূপ :

   'আল্লাহ্ মানুষের সুদূরপ্রসারী কল্যাণের জন্যই নিয়ামত বন্টনে বৈচিত্র্য দিয়েছেন। সচ্ছলতার ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারণ জাহিলী নীতি। দুনিয়াতে বহু জঘন্য ব্যক্তিকে সচ্ছল দেখা যায়। আবার বহু পবিত্র চরিত্রের লোকদের দেখা যায় যারা খুবই গরীব।

   একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিভাবে দাবি করতে পারে যে, আল্লাহ্ এসব অভাবীদেরকে ঘৃণা করেন? আর ভালোবাসেন ঐসব নীচ হৃদয়ের বিত্তশালী লোকদেরকে?[৯]

৪. 'কিন্তু মানুষের অবস্থা হলো এই যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন এবং (এ উদ্দেশ্যে) সম্মান ও নিয়ামাত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাঁর রিযিক সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।[১০]

৫. বিভিন্ন আয়াতে[১১] জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের অবাধ্যতার প্রতিফল স্বরূপ অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, বিপর্যয়সহ নানারূপ সংকীর্ণতা দ্বারা দুনিয়াতে আযাব দেয়া হয়। এ আযাব ব্যক্তিগত বা জাতিগত উভয় ক্ষেত্রেই আসতে পারে।

৬. 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিপদ স্পর্শ করলে সে ঘাবড়ে যায়। আর স্বচ্ছন্দ আসলে কার্পণ্য শুরু করে।'[১২]

৭. 'অভাবের আশংকায় তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করো না।'[১৩]

৮. বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব ও দুর্বল আর জাহান্নামীদের অধিকাংশই সম্পদশালী, প্রতাপশালী এবং নারী।[১৪]

৯. তবে জান্নাতী হবার জন্য দারিদ্র্য বহাল রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আর জাহান্নামী হবার জন্য সম্পদকে দায়ী করা হয়নি।

এরূপ আরো বহু তথ্য কুরআন ও হাদীসে মজুদ রয়েছে। এসবের শিক্ষা নিম্নরূপ :

* দারিদ্র্য মানব জীবনের অজস্র সমস্যাবলীর অন্যতম এবং জীবিকার প্রাচুর্য অজস্র নিয়ামতের অন্যতম। ব্যক্তি, স্থান ও সময়ভেদে সমস্যা বা নিয়ামত প্রদানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার নীতি। সাইয়েদ মওদূদী বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে পেশ করেছেন :

  'আল্লাহ তাআলা তাঁর দান ও অনুগ্রহসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ নিজের মহাপ্রজ্ঞার ভিত্তিতে কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। সৌন্দর্য, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর, শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক শক্তি, মেধা, জন্মগত পরিবেশ এবং অনুরূপ অপরাপর নানা প্রকার নিয়ামত সব মানুষকে সমানভাবে দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে জীবিকার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে জীবিকার তারতম্য হওয়া আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিরই রীতি।'[১৫]

* উপরোক্ত শিক্ষার কারণে রসূলুল্লাহ স. প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য উভয়ের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।[১৬]

বর্তমানে বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য বিশেষ কৌশলে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন পরিচালনা করছে। দারিদ্র্যবিমোচন করতে গিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই আগ্রাসনের কবলে পড়ছেন। তারাও বস্তুবাদীদের মতই বলছেন যে, দারিদ্র্য, অপরাধ ও সন্ত্রাস পরস্পর নিবিড়ভাবে যুক্ত। আসলে আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নয়; অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হলেও সামগ্রিক উন্নতি হতে মানবতা বঞ্চিত হবে। তাই ইসলামের আলোকে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

**ইসলামে উপস্থাপিত দারিদ্র্য দূরীকরণ পদ্ধতি**

ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি মানব রচিত মতবাদগুলোর তুলনায় অসাধারণ। এক্ষেত্রে ইসলামের কৌশল ২টি। আখেরাতের চেতনা ও মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ এবং আইনগত প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন। আমরা ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াদ্বয় সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

**ক. চেতনাকে হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য শর্তকরণ**

বিভিন্ন আয়াতে[১৭] এরূপ শর্তারোপ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সূরা আল-বালাদের আয়াতগুলো খুবই প্রভাবশালী। এখানে হেদায়াত প্রাপ্তির পথকে দুর্গম পথ বলা হয়েছে। ক্রীতদাস মুক্ত করা

ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অভাবীদেরকে দান করাও এই দুর্গম পথের অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দানশীলতার চেতনা বর্জিত লোকেরা হেদায়াত লাভ করতে পারবে না। এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে[১৮] দান না করাকে জাহিলী বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সূরা আল-মুদ্দাসসিরে বলা হয়েছে, যে কেউ জাহান্নামে আসলে জান্নাতীদের এরূপ প্রশ্নের জবাবে জাহান্নামীরা যেসব কাজের কথা বলবে সেগুলোর একটি হলো এই যে, তারা মিসকীনদেরকে খাবার দিতো না।

**খ. দানশীলতা, দয়া, প্রদর্শন এবং যাকাতের চেতনাকে মুমিনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপন**

১. যাকাতের আইনগত ন্যূনতম পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় ৯ম হিজরীতে। কিন্তু তারও পূর্বে মক্কী সূরাসমূহেও যাকাত প্রদানের নির্দেশ[১৯] দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। দানকেই যাকাত বলা হয়েছে। হামীম-আস-সাজদার আয়াতদ্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'ধ্বংস হয়েছে, মুশরিকরা যারা যাকাত প্রদান করে না।'

অথচ মক্কী যুগে যাকাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর মুশরিকরা কেনইবা যাকাত দিবে। এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, যাকাত তথা দানের চেতনা মুমিনের বৈশিষ্ট্য; মুশরিকদের এই বৈশিষ্ট্য থাকে না।

২. বিভিন্ন আয়াতে আখেরাতে মুক্তির জন্যই দারিদ্র্য বিমোচনে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[২০]

৩. দয়াপ্রাপ্তিকে অভাবীদের অধিকার ঘোষণা : 'ফসল আহরণের দিন তাঁর (আল্লাহর) অধিকার আদায় কর।'[২১]

এখানে আল্লাহর অধিকার বলতে বান্দাহ'র অধিকার বোঝানো হয়েছে। সূরাটি পুরোটাই মক্কী যুগের। তখনো যাকাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

বলা হয়েছে, 'যারা তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট অধিকার সম্পর্কে অবগত।'[২২]

'তাফহীমুল কুরআনে' বিবৃত আয়াতটির তাফসীরের[২৩] কিছু অংশ নিম্নরূপ :

যাকাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় মদীনায়। কিন্তু প্রখ্যাত তাফসীরকারগণ একমত যে উক্ত মক্কী সূরাটিতে এটাই বলা হয়েছে যে, ঈমানদারগণ অভাবীদের জন্য স্বতস্ফূর্তভাবেই কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে রাখেন।

৪. হাদীসের শিক্ষা : রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, দুর্বল ও নিঃস্বদের উছিলাতেই সচ্ছল মানুষেরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হয়।[২৪]

এখানে একইসাথে নিঃস্বদের মর্যাদা ও অধিকার বিবৃত হয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ও ঘাস যদি কেউ অন্যকে (যার অভাব আছে) প্রদান করতে অস্বীকার করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন না; তার দিকে তাকাবেন না।[২৫]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'জাহান্নাম হতে বাঁচ, একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও।'[২৬]

### গ. আইনগত প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন

নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার পরেও ৯ম হিজরীতে মুসলিম বিত্তশালীদের জন্য দানের ন্যূনতম পরিমাণ ধার্য করা হয়। যে কোন ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো উক্ত দানকে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে (কোষাগার) সংগ্রহ করা। এই পরিমাণ নির্দিষ্টকরণের কারণ সম্পর্কে সাইয়েদ মওদূদী'র বলেন, 'ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান, উৎসাহ প্রদান ও সহানুভূতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র দ্বারা দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। যাতে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে দয়াপরায়ণতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও যেসব লোক বদ মনোবৃত্তির কারণে সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জিভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোন না কোনভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায় তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে।[২৭]

সূরা আত-তওবার ১০৩ আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয় : '(হে নবী) তাদের সম্পদ হতে একটি সাদাকা উসূল (আদায়) কর।'

আয়াতটিতে 'সাদাকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, সাধারণত লোকেরা যে সাদাকা বা যাকাত দেয় এটা সেরূপ নয়। এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায়ের নির্দেশ। তখনকার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান রসূলুল্লাহ স. এটা আদায় করেছেন। বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ তাঁর রসূল স.-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন।[২৮]

ইসলামী রাষ্ট্রের সাদাকা বা যাকাত আদায়ের জন্য হাদীসে নিম্নোক্ত পরিমাণসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে :

১. সোনা, রূপা কিংবা অর্থ আকারে সঞ্চিত সম্পদের যাকাত বার্ষিক ২.৫%।
২. প্রাকৃতিক বর্ষণে উৎপাদিত ফসলের ১০% ও কৃত্রিম সেচে উৎপাদিত ফসলের ৫% যাকাত বা ওশর দিতে হবে।
৩. ব্যক্তি মালিকানাধীন খনিজ সম্পদ বা প্রোথিত সম্পদের যাকাত ২০%।
৪. ভেড়া, ছাগল, গাভী, উট প্রভৃতির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নিসাব ও পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে।[২৯]

হাদীসে যাকাতের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বিবৃত হয়েছে। যেমন 'পাঁচ ওয়াসাকের (ত্রিশ মণ) কম ফসলে যাকাত বাধ্যতামূলক নয়।'[৩০]

ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ হাদীসগ্রন্থ, ফিকাহগ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্যরাজিতে সাদাকার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

### 'সাদাকা' প্রদানের খাতসমূহ

সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে সাদাকা বা যাকাত প্রদানের ৮টি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা ১. ফকির, ২. মিসকীন, ৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী, ৪. কাফের ও নওমুসলিমদের মন জয় করা, ৫. ক্রীতদাস মুক্তি, ৬. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য, ৭. আল্লাহর পথে (সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের উচ্ছেদ) এবং ৮. (বিপদগ্রস্ত) পথিকদের সাহায্য।

আয়াতটিতে 'মিসকীন' শব্দটি চরম দরিদ্রদেরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীসে বিবৃত হয়েছে, বিপর্যস্ত হয়েও যারা আত্মমর্যাদাবোধের কারণে ভিক্ষা চাইতে পারে না তাঁরাই আসল মিসকীন।[৩১]

**শুধু যাকাতই কি ফরজ দান?**

মুসলমানদের অনেকে ধারণা পোষণ করেন যে, নিসাবের অধিকারীগণের জন্য নির্ধারিত যাকাতই ইসলাম নির্ধারিত ফরজ দান। এছাড়া দানচর্চা নফল ইবাদাত। এ ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা সৃষ্টির পথে বিরাট অন্তরায়।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাফসীর 'ফি যিলালিল কুরআনে' এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যাকাত প্রদানের পরও দানের নির্দেশ যথারীতি বহাল থাকে (তবে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়)। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রও জরুরী বোধ করলে যাকাত আদায়ের পরেও বিত্তশালীদের কাছ থেকে সম্পদ আদায়ের অধিকার রাখে।[৩২]

এ সংক্রান্ত একটি হাদীস নিম্নরূপ : 'যাকাত ছাড়াও সম্পদে অন্যের অধিকার আছে।'[৩৩]

**ঘ. সুদ নিষিদ্ধকরণ**

সুদের নিন্দায় প্রথম আয়াত বিবৃত হয় মক্কী যুগে হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে নাযিলকৃত সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। অতপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়। (সূরা আলে ইমরান ১৩০, বাকারা ২৭৫-২৭৮)

এর ফলে অভাবীদের বিপদকে পুঁজি করে অর্থাৎ অভাবীদেরকে ঋণ দিয়ে অর্থের পাহাড় গড়ার পথ রুদ্ধ হয়।

**ঙ. মওজুদদারী নিষিদ্ধকরণ**

বর্তমানে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে বাজারসমূহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অসৎ ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য মওজুদদারী। আগেও পৃথিবীবাসী এ সমস্যায় ভুগেছে। উৎপাদনের মওসুমে চাহিদামত সরবরাহ বন্ধ রেখে পরবর্তী সময়ে চড়ামূল্যে বিক্রয় করাই মওজুদদারী। এতে করে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তবে অভাবীরাই বেশি কষ্ট পায়।

মওজুদদারী নিষিদ্ধ করে ইসলাম পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করেছে। এ নিষিদ্ধকরণ কুরআনে করা হয়নি। আল্লাহ তাঁর রসূল স.-এর মাধ্যমে মজুদদারী নিষিদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে মওজুদদারকে নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। ইবনে উমর রা. বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ব্যবসায়ী ৪০ দিনের বেশি সময় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, আল্লাহ তার দায়িত্ব হতে মুক্ত। আল্লাহর রসূল স. আরও বলেছেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা যথাসময়ে চাহিদামত দ্রব্যাদি বাজারে সরবরাহ করে তাঁরা আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য।[৩৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাহিদামত সরবরাহ করার পরে পচন ও অপচয় হতে রক্ষার্থে পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বটে তবে পরিস্থিতি বুঝে মজুদ মাল ছেড়ে দিতে হবে, যাতে জনগণের কোন কষ্ট না হয়।

মওজুদদারী নিষিদ্ধকরণ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি পরোক্ষ পদ্ধতি। কারণ গরীব লোকেরাই এতে বেশি উপকৃত হয়।

**চ. ভিক্ষাপেশা নিষিদ্ধকরণ ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি**

ইসলামে দানশীলতার যে বিপুল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নেই যে, ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি বা মানুষের দান সংগ্রহ করা পছন্দ করে। বরং কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে আল্লাহর নিয়ামতরাজি সংগ্রহের নির্দেশ আছে। তবে বিভিন্ন রকম দুর্দশা ও মুসীবত মানবজীবন এবং সমাজ জীবনের অনিবার্য অংশ। দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা উভয়টিই আল্লাহর আনুগত্য ও ধৈর্যের পরীক্ষা। তাই ইসলামের নির্দেশনা হলো হাত পাতার আগেই স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অভাবীদের অধিকার বুঝিয়ে দিক।

মানব রচিত মতবাদগুলোর প্রবক্তা ও ধারকবাহকবৃন্দের ক্ষেত্রে তত্ত্ব (Theory) ও বাস্তবায়নে (Practical) পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু ইসলাম কথা ও কাজের বৈপরিত্যকে প্রশ্রয় দেয় না। যুগে যুগে তাই আল্লাহর নবী ও রসূলগণ দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনীতি বিষয়ে কেবল ইসলামের বক্তব্যই পেশ করেননি নিজেরাও বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

একটি হাদীসে আছে যে সকল নবীই রাখাল ছিলেন।[৩৫]

আরেকটি হাদীসে আছে যে, যাকারিয়া আ. ছুতার (কাঠমিস্ত্রী) ছিলেন।[৩৬]

আল্লাহর প্রিয় রসূল, লোহিত সাগর বিজয়ী বীর, তাওরাত কিতাবের ধারক হযরত মূসা কালিমুল্লাহ আ. ফিরআউনের ভয়াবহ নির্যাতন থেকে বাঁচতে মাদয়ানে হিজরত করেছিলেন। সেখানে একটি খোদাভীরু পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। অসহায় অবস্থায় তাঁর বিয়ের মোহরানা ছিলো শ্রমিক বা কর্মচারী হিসেবে শ্বশুর বাড়িতে কাজ করা। ন্যূনতম ৮ বছর চাকরি করার শর্তে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো।'[৩৭]

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে শ্রেণীভেদ প্রথা ছিলো এবং আছে। ছোট ছোট কাজকে অনেক সমাজে কিছুটা ঘৃণার চোখে দেখা হয়। হিন্দু সমাজে কাজের ধরনের ভিত্তিতে প্রধানত ৪টি শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু ইসলামে কাজের ক্ষেত্রে কোনো বড় ছোট নেই। মহান আল্লাহ নবীদেরকে মানবজাতির মডেল ও পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা সব ধরনের কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সব কাজ সমান।

রসূলুল্লাহ স. শুধু তিন প্রকার বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য দুর্দশাকালীন সময়ে ভিক্ষা করার অনুমোদন দিয়েছেন। স্থায়ী ভিক্ষাবৃত্তি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হারাম। মানুষ মানুষের কাছে হাত পাতুক তা পছন্দ করা হয়নি। প্রয়োজন পূরণের পরেও সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করা যেন জাহান্নামের আগুন সংগ্রহ করা।[৩৮]

### ইসলামের ইতিহাসে দানশীলতা ও কর্ম সৃষ্টির একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

মক্কার লোকেরা ইসলাম কবুল করলো না। কিন্তু মদীনাবাসী রসূলুল্লাহ স.-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত বলে খবর পাঠালো। অতপর মক্কার অসহায় সাহাবারা মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনার আর্থিক অবস্থা আগেও দুর্বল ছিলো। মক্কার সাহাবীদের আগমনে খাবার ও স্থান সংক্রান্ত সমস্যা আরো প্রকটরূপ ধারণ করলো। এই জটিল সমস্যা সমাধানে রসূলুল্লাহ স. কোন আইন জারি করলেন না। হযরত আনাসের বাড়িতে মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের একটি সম্মেলন হলো। সম্মেলনে আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরস্পরের ভাই বলে ঘোষণা করা হলো। অতপর আনসারগণ তাঁদের সম্পদ ও স্থানের অর্ধেক মুহাজিরদের দান করলেন। এই দান পেয়ে মুহাজিরগণ অলস হয়ে বসে থাকলেন না। দানের পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন।[৩৯]

### অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নামে প্রদর্শনী এবং মানুষের শৃঙ্খলা বিনষ্টকরণ

মানুষের দুর্দশা ও অভাবকে পুঁজি করে অসৎ নেতৃত্ব কর্তৃক সম্পদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা যায়। বর্তমানে দরিদ্র দেশসমূহে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নামে বিভিন্ন আঙ্গিকের শোষণ ব্যবস্থাও ইতিহাসের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আধুনিক বস্তুবাদের প্রভাবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে একটি বিশেষ খারাবী যেন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলো এসব দেশে কম টাকায় কর্মঠ ও অনুগত শ্রমিক পাওয়া যায়। বিশেষ করে বেসরকারি কর্মক্ষেত্রগুলোতে এই শ্রমশোষণ ব্যবস্থার মাত্রা বেশি। সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে কাজ সৃষ্টির বুলির প্রদর্শনী চলে। কিন্তু মানুষের জীবনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে একটি বিশেষ শ্রেণীর পকেট ভারী করা হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম ন্যায্য অধিকার প্রদানের চেতনা খুবই দুর্বল। এমনকি তাঁদের জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারও নানাভাবে ভূলুণ্ঠিত। আমি এ প্রসঙ্গে দুই বা তিনটি উদাহরণ বিবৃত করতে চাই।

একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ২০০৭-এর ১৫ই নভেম্বরের প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ের উপর একটি রিপোর্টের কিছু অংশ উল্লেখ করছি : 'বহদ্দার (মালিক) এবং মাঝিরা হাজার হাজার শুটকি শ্রমিক এবং জেলেকে ঘূর্ণিঝড়ের রাতে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেছে। এ হতভাগ্যরা সেই কাল রাতে সুযোগ পেলে প্রাণে বেঁচে যেত। সুন্দরবনের চরগুলোতে অনিবার্য মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যেও দাস জীবনের পরিত্রাণ ঘটেনি। দাসপ্রথা সমাজে না থাকলেও চর এলাকায় বহাল রয়েছে। মাঝি-বহদ্দাররা সাগর পাড় থেকে চার নম্বর সতর্ক সংকেত পেয়েই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আর হাজার হাজার শ্রমিককে বাধ্য করে চরে এবং নৌকায় থাকতে। দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার পরও তাদেরকে নৌকা থেকে বের হতে দেয়া হয়নি।'[৪০]

রিপোর্টটিতে বেঁচে যাওয়া জেলে খাদেমুল ইসলাম উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, ৫ মাসে মাত্র ১৭ হাজার টাকার জন্যে এক বহদ্দারের সাথে সে চরে আসে। বেঁচে যাওয়া জেলেদের বক্তব্য হলো বিপদ সংকেত পাবার পর যার যার মত করে আশ্রয়ে যাবার জন্য ছুটি দেয়া হলে হাজার হাজার জেলের জীবন রক্ষা পেত।[৪১]

২০০৭ সালের জুলাইর শেষ দিকে শিল্পকলা একাডেমীতে জাতীয় মৎস্যমেলায় প্রচারিত বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডারে 'শুধু লাভ চাই' এই নীতিই প্রবল দেখা গেছে। যাদের দিনভরের খাটুনির সাহায্যে লাভটা আসছে তাদের ন্যূনতম অধিকারটুকু দেবার প্রবণতা সেসব প্রকাশনার কোথাও দেখা যায়নি।

বিভিন্ন ফোল্ডারে, লিফলেটে ৬ বা ৮ মাসের মধ্যে বিভিন্ন আকারের জমিতে, বিভিন্ন প্রকৃতির মাছ চাষের লাভের অংক দেখানো হয়েছে, ১ বা ২ লাখ হতে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু কোনখানেই খরচের খাতে শ্রমিকের বেতনের হার মাসে ৩,০০০ টাকার বেশি বলা হয়নি।[৪২] মনে হয় যেন ৩,০০০ টাকার বেশি বেতন প্রদান করা কোন গর্হিত কাজ।

যার লাভের অংক এক বা দেড় লাখ তার জন্যে ৩,০০০ টাকার বেশি দেয়া হয়তো কঠিন। কিন্তু যার লাভ লাখ লাখ টাকা তিনি কি শ্রমিককে একটু বেশি দিতে পারেন না?

ইসলাম ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের নির্দেশ দিয়েছে। ৩,০০০ টাকার সাহায্যে বর্তমান বাজারে একজন ব্যক্তির পক্ষে কি মধ্যম আকারের একটি পরিবার নিয়েও ন্যূনতম স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা সম্ভব?

এ প্রসঙ্গে আমি পাশ্চাত্যের বিখ্যাত গবেষক ড. অ্যালেক্সিস ক্যারেলের কিছু উপস্থাপনা উল্লেখ করতে চাই।

'শৈল্পিক জীবন সংগঠিত করতে গিয়ে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আজকের বিভিন্ন শিল্প বণিক সংগঠন 'কম খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন' নীতি অনুসরণ করে। ব্যক্তি গ্রুপের সর্বোচ্চ আয় এগুলোর আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিল্প উন্নয়নে মেশিনের পেছনের মানুষগুলোর মৌলিক প্রকৃতি এবং তাদের ও তাদের সন্তানদের ওপর কারখানার নকল জীবন ধারার প্রভাব বিবেচনা না করেই গড়ে তোলা হয়েছে।'

'সত্যিকার ব্যাপার হলো বর্তমানের শিল্প-সভ্যতা এমন এক অবস্থার জন্ম দিয়েছে যাতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। আজকের শহুরে মানুষগুলোর উদ্বেগ ও যন্ত্রণা তাদেরই সৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ফলশ্রুতি।'

'অর্থনীতিবিদগণের বুঝতে হবে মানুষকে। তাদেরকে কাজ, খাদ্য ও অবকাশ দেয়ার সাথে সাথে ভিন্ন রকমের জিনিসও দিতে হবে। কেননা তাদের জীবনে আত্মিক দিকও রয়েছে।'[৪৩]

ড. ক্যারেলের কণ্ঠে ইসলামের বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শুধু কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করলেই দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। কারণ শুধু অর্থাভাবই দারিদ্র্য নয়। মানুষ অর্থনৈতিক জন্তু বা কীট নয়। মানুষ

আরো বহু কিছু ধারণ করে। সবদিক সমন্বয় করেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

বর্তমান দুনিয়াতে অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণ ও কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনায় শুধু আর্থিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। এতে করে জীবনের অন্যান্য দিকগুলো বিপর্যস্ত হয়েছে। উদাহরণত বলা যায় যে, শরীরে কোন একটি অঙ্গের চিকিৎসার সময় চিকিৎসককে শরীরের সার্বিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। এবং সার্বিক অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। পুরো শরীরের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শুধু কোন একটি অঙ্গের চিকিৎসা করতে গেলে বেচারা রোগীর জীবনে ভয়াবহ পরিণতি এমনকি মৃত্যুর ছায়া নেমে আসতে পারে।

সাইয়েদ মওদূদী এ বিপর্যয়কে নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত করেছেন–

'অনুরূপভাবে নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সব বিষয় ও শাস্ত্রের মাঝে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবশালী করার দ্বারা সাংঘাতিক বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কারণ মানব জীবনের এ সকল বিভাগের ভিত্তি তো অর্থনীতি নয়। সবকিছুকে যদি অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়, সেক্ষেত্রে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রবৃত্তি পূজা ও বস্তুপূজায় রূপান্তরিত হবে। যুক্তিবিদ্যা অন্নবিদ্যায়, সমাজ বিজ্ঞানের সমগ্র স্তর সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের পরিবর্তে ব্যবসায়িক কার্যধারায় এবং মনোবিজ্ঞান মানসিকতা অধ্যয়নের পরিবর্তে মানুষকে নিছক অর্থনৈতিক জীব হিসেবে বিশ্লেষণ করার শাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় মানবতার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর হতে পারে না।'[৪৪]

কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টির একটি বিশেষ দিক হলো কর্মীর সংখ্যা কিছু কম রাখার চেষ্টা করা হয় এবং অল্প লোকের দ্বারা অধিক লোকের কাজ আদায় করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, বেতন প্রদান খাতে খরচ কমানো। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা মালিকের উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হন। জীবনের অন্যান্য অংশের দিকে তাকাবার সুযোগ তাদের হয় না।

কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্য হতে হবে সম্ভাব্য সর্বাধিক লোকের কর্মসংস্থান। শ্রমনীতিও হতে হবে সুস্পষ্ট। যাতে করে মালিকের ভাণ্ডার ভারী করতে গিয়ে কর্মচারীদের জীবনের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত না হয়। মনে রাখা দরকার যে, সচ্ছলতা বা বিলাসিতার চেয়ে সুশৃঙ্খল জীবনের (চবৎভবপঃ খরভব ঝঃৎঁপঃঁৎব) গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু বিশৃঙ্খল জীবন ধ্বংসশীল।

শ্রমিকদের ব্যাপারে আল্লাহ ভীতি এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে বিত্তশালীদের বিশেষ দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল স. শ্রমনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। যেমন ইন্তিকালের পূর্বে রসূল স. বলেছিলেন, 'নামায ও অধীনস্তদের (শ্রমিক ও কর্মচারী) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।'[৪৫]

'তাঁর (অধীনস্ত) ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানো যাবে না। নিতান্তই যদি চাপাতে হয়, সেক্ষেত্রে তার সাথে নিজে কাজ করতে হবে।'[৪৬]

মানবতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বিত্তশালীদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কেও কুরআন ও সুন্নাহ জ্বলন্ত প্রমাণ আছে। যেমন আয়েশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স. ঘরে এসে অভ্যাসমত একটু উঁচু গলায় বার বার বলতেন, আল্লাহ বলেন, 'ধন-সম্পদ আমি কেবল নামায কায়েমও যাকাত দানের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। যে আল্লাহর দিকে আসে, আল্লাহও তাঁর দিকে আসেন।'[৪৭] নামায কায়েম মানে শুধু মসজিদ বানানো ও জামাতে নামায পড়া নয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূল স.-এর আনুগত্য করার যে ওয়াদা নামাযে করা হয়, তার বাস্তবায়নই নামায কায়েম। আর যাকাত দান মানেও শুধুমাত্র ২½% পরিমাণ দান নয়। মানবতার উন্নয়নে নিঃস্বার্থ অর্থদানের প্রেরণাই যাকাতের আসল চেতনা। আমরা পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। ৯ম হিজরীতে যাকাতের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণে পূর্বে যাকাতের এ চেতনাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

ইসলামের চেতনা প্রতিষ্ঠিত থাকলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নামে প্রদর্শনী ও বিত্তশালীদের সম্পদের পাহাড় গড়ার মানসিকতার অস্তিত্ব থাকতো না। অজস্র মানুষের জীবন শৃঙ্খলও বিপর্যস্ত হতো না। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে শ্রম আইন ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে কিছু প্রস্তাবনা প্রদান করা হবে।

**দারিদ্র্য বিমোচন ও জন্মরোধ প্রসঙ্গে**

বর্তমান পৃথিবীতে উদারতা ও সভ্যতার নামে চরম সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা ও নির্মমতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। যে কোন সমস্যার সমাধানেই জন্মরোধকে অন্যতম উপায় বলে ঘোষণা ও প্রচার করা হয়। এ কথা সত্য যে অমুসলিম বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকে জন্মরোধের চেতনার ঘোর বিরোধী, কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। তবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে জন্মরোধ কতটুকু বাস্তবানুগ এ সম্পর্কে দু'চার কথা বলা জরুরী মনে করছি।

ইসলামে জন্ম-মৃত্যু নির্ধারণের কোন অধিকার মানুষকে দেয়া হয়নি। এ বিষয়টিকে আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছা, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং তাকদীরের অধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী-রসূলদের নির্দেশিত জীবনধারায় তাদের অনুসারীরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন বার বার। কিন্তু নবীগণ তাদেরকে জন্মরোধের পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেননি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়েও অনেক নবী পরিচালিত রাষ্ট্রে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুর্ভিক্ষ, অভাব ইত্যাদি এসেছে। কিন্তু সেখানেও জন্মরোধের আশ্রয় গ্রহণের কোন নজির নেই। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে জন্মরোধ বিশেষ কার্যকর ভাবার অবকাশ নেই।

বিভিন্ন আয়াতে[৪৮] মানুষের জন্মকে আল্লাহর একচ্ছত্র পরিকল্পনাধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিলো না। তবে বিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত পন্থায় শুক্রাণু বাইরে নিক্ষেপের মাধ্যমে জন্মরোধের সীমিত কিছু প্রচেষ্টা ছিলো। তবে এটি সারা পৃথিবীতে কখনোই জনকল্যাণের মাধ্যম বিবেচিত হয়নি। জাহেলিয়াতের যুগে আরবে এ প্রচেষ্টা থাকলেও রাসূলুল্লাহর স.-এর ভাষ্য অনুযায়ী তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্যে এর প্রচলন

ছিলো না। আধুনিক প্রাণিবিদ্যায় জন্ম ও জন্মরোধ সংক্রান্ত আলোচনাতে শুক্রাণু বাইরে নিক্ষেপ (হাদীসের ভাষায় আযল) প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, এ প্রক্রিয়ায় সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম। বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এ সংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীস[৪৯] বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম ৫ম খণ্ডে সবচেয়ে বেশি ২৩টি[৫০] হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলোর মূল বক্তব্য বা শিক্ষা সংক্ষেপে বিবৃত করছি :

১. মানুষের আগমন তাকদীরের অধীন। অতএব আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদীরকে মেনে নাও।
২. জন্মরোধের প্রচেষ্টার কার্যকারিতা অর্থাৎ সফলতার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। আধুনিক প্রাণিবিদ্যাতেও একই কথা বলা হয়েছে।
৩. কয়েকজন সাহাবী আযল সম্পর্কে জানতে চাইলে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, রোম ও পারস্যের মত পরাশক্তিরা এ সংস্কৃতির চর্চা করে না। তাতে তো তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। (অর্থাৎ তাহলে তোমরা উৎসাহিত হচ্ছো কেন?)[৫১]
৪. পরিশেষে দুগ্ধপায়ী শিশুর দুধপানের মেয়াদে (২ বছর) জন্মরোধের প্রচেষ্টাকেও 'গুপ্ত হত্যা' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে কন্যাশিশুকে হত্যাকারীর কাছ থেকে আল্লাহ যে জবাবদিহিতা নেবেন দুগ্ধদানরত অবস্থায় জন্মরোধ প্রচেষ্টাকারীর কাছ থেকেও সেভাবেই জবাব নেবেন।[৫২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে বলেছেন গর্ভধারীণীর মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যা প্রমাণিত হলে জন্মরোধ করা যাবে।

আশার কথা যে, গত শতাব্দীতে এবং এখনও অজস্র অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক ও বিজ্ঞানী ম্যালথাজিম ও পুনর্বিন্যস্ত এবং সংশোধিত নয়া-ম্যালথাজিমকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও করছেন। তাদের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সূচনাকরী উক্ত মতবাদদ্বয় আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অযৌক্তিক মতবাদ। ইতিহাসখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ইমার ও ডাকী জন্মনিয়ন্ত্রণের চেতনার ধারক-বাহকদেরকে প্রকৃতি ও মানবতার দুশমন বলে আখ্যায়িত করেন।[৫৩] মহান আল্লাহও আল-কুরআনে সে কথাই বলেছেন।[৫৪] অমুসলিম হয়েও ইসলামের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করায় তাঁদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

**কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ**

এ প্রসঙ্গে সহজ কথা হলো ইসলামের দৃষ্টিতে গৃহের মৌলিক দায়িত্ব পালনের পরই মহিলাদের বহির্মুখী ভূমিকা পালনের অনুমতি রয়েছে। মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনাও এ বিষয়কে রক্ষা করেই সম্পন্ন করতে হবে।

মহিলাদের প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান কর...।'[৫৫] আয়াতটিতে 'কারনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হবে স্থির হয়ে/ নিশ্চিন্তে/ শান্তভাবে/ নির্বিঘ্নে অবস্থান কর।[৫৬]

আল-হাদীসে গৃহে অবস্থানকে মহিলাদের জিহাদ বলা হয়েছে। স্বামী ও সন্তানের অধিকার সুরক্ষা করা মহিলাদের প্রধান পেশা হবে। অতপর সে বাইরের জগতে ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমানে মহিলাদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় আল্লাহ নির্দেশিত মহিলাদের গৃহমুখীতার প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাছাড়া এক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহযোগিতা গ্রহণকেও মোটেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। বরং এটাকেই সভ্যতার অন্যতম মানদণ্ড ধরা হয়। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সুদূরপ্রসারী ফলাফল হবে ধ্বংসাত্মক।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গে জনৈক আরব লেখকের একটি বহুল পরিচিত পুস্তিকায়[৫৭] বলা হয়েছে।

ক. অভিভাবকের অনুমতি থাকতে হবে।

খ. কাজটি শরীয়তসম্মত হতে হবে, তাতে পর্দা লংঘিত হবে না।

গ. কাজটি সামাজিক ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া।

ঘ. শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কাজ না হওয়া।

ঙ. কাজটি এমন হতে হবে যা তার মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটাবে না।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ মওদূদী'র একটি বক্তব্য নিম্নরূপ :

'ইসলাম যদি যুদ্ধের সময় নারীকে আহতদের পরিচর্যায় কাজে লাগায় তবে তার অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক অবস্থাতেও নারীকে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায়, ক্লাবে এবং রাষ্ট্রীয় সামাজিক নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে।[৫৮]

অর্থাৎ মুসলিম সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হবে মহিলাদের গৃহমুখীতা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা। আর তাদের বাইরের কাজও এ স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করবে না। মহিলাদের বহির্মুখী দায়িত্ব পালনের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি উৎসাহিত করা যাবে না।

**কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা ও শ্রম আইন বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা**

১. কর্মক্ষেত্রের মালিকগণ কর্মচারী ও শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক উৎপাদন সংক্রান্ত খেদমত গ্রহণের ও বেতন প্রদানের সাথে সাথে তাদের শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে যত্নবান হবেন।

২. দেশের বিভিন্ন এলাকার কর্মক্ষেত্রে এতটা পরিমাণ ন্যূনতম বেতন বা মজুরী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যা দ্বারা যে এলাকায় কর্মক্ষেত্রটি অবস্থিত সে এলাকায় কর্মী ও তার পরিবারের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় ন্যূনতম বেতনে পার্থক্য হতে পারে। যেহেতু বিভিন্ন এলাকায় জীবন পরিচালনার খরচ ভিন্ন। উদাহরণত বলা যায় যে ঢাকার বেতন আর রংপুরের বেতনে পার্থক্য থাকা উচিত।

৩. কাজের সময়ের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক যে মানদণ্ড রয়েছে (৮ ঘণ্টার কর্মসময়) সেটা যাতে সব প্রতিষ্ঠানে রক্ষা হয় সেজন্যে সামাজিক চেতনা গড়ে তোলা দরকার।

৪. যেসব ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় কাজ নেবার প্রয়োজন হয় সেখানে একাধিক শিফটে ৭ বা ৮ ঘণ্টা করে একাধিক কর্মী দল নিয়োগ করতে হবে।
৫. পুরুষ ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা থাকতে হবে।
৬. ইসলামের দৃষ্টিতে গৃহে অবস্থান নারীদের প্রধান দায়িত্ব। অতপর বহির্মুখীতা। এই চেতনা সমুন্নত রাখতে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা ও বাস্তব কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা অপরিহার্য।
৭. যে মহিলাগণ বাইরে কাজ করবেন তাদের কাজকে অফিসিয়াল ও যান্ত্রিক দৃষ্টিতে না দেখে মানব সভ্যতার জন্য বিশেষ খেদমত হিসেবে দেখতে হবে ও কাজকে সহজসাধ্য করে দিতে হবে।
৮. কর্মস্থলে দুগ্ধপায়ী ও ছোট শিশুদের জন্য বিশেষ কক্ষ থাকা নিশ্চিত করতে হবে। এতে শিশু অধিকার সমুন্নত থাকবে এবং মায়েরাও প্রশান্তির সাথে (in peacefull mind) কাজ করতে পারবেন।
৯. সন্তান ধারণে সক্ষম বিবাহিতা মহিলাদের কাছ থেকে গড়ে ৪ ঘণ্টার বেশি কাজ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। কারণ তাদের বহির্মুখী কাজের চাপ বেশি থাকলে শিশু অধিকার লংঘন, জন্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয়গ্রহণ এবং অন্যান্য ইসলামী চেতনা লংঘিত হবার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে। গড়ে ৪ ঘণ্টার দায়িত্ব ২টি পলিসিতে দেয়া যেতে পারে।
   ক. হাসপাতালসহ যেসব ক্ষেত্রে ৪ ঘণ্টায় কোন কাজের ধাপকে ভালোভাবে সম্পন্ন করা কঠিন সেখানে নার্সও মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে ১দিন পরপর ৮ ঘণ্টা করে কাজ নেয়া যেতে পারে। এতে করে কাজও সম্পন্ন হবে আর মহিলা কর্মীরা ১ দিন প্রশান্তির সাথে পরিবারে সময়ও দিতে পারবেন।
   খ. স্কুলসহ যেসব ক্ষেত্রে ১ দিন করে বিরতির মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দূরূহ সেখানে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে কাজ দেয়া যেতে পারে।
১০. সন্তান ধারণে সক্ষম বিবাহিতাদের সাপ্তাহিক ছুটি ২দিন নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ তাদের সাপ্তাহিক দায়িত্ব হবে ৫ × ৪ = ২০ ঘণ্টা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উল্লিখিত প্রস্তাবনাসমূহের সবগুলো এ মহূর্তেই বাস্তবায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তবে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আখিরাতের চেতনাই মানবতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। মক্কার অসহায় সাহাবীগণের মদীনায় হিজরতের পর মদীনাবাসীরা দানশীলতা ও কাজ সৃষ্টির অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন এ চেতনার ভিত্তিতেই। ইসলাম আইনগত ব্যবস্থা প্রণয়নকে প্রধান সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাই আমরা দেখতে পাই যে, যাকাতের ন্যূনতম আইনগত পরিমাণ নির্ধারণের আগেই এমনকি ওহী নাযিলের প্রাথমিক সময় থেকেই যাকাত ও দানশীলতার জন্য বিপুল নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের

মানসিক সংশোধন সম্পন্ন না হলে আইনগত ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। মূলত আখিরাতের আযাবের ভীতি ও জান্নাতের আশাই সুশৃঙ্খল সভ্যতা গঠনের এক নম্বর অস্ত্র।

আজ দরিদ্র দেশসমূহে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির নামে ব্যতিক্রমধর্মী আগ্রাসান চলছে। ইসলামী শ্রমনীতির আনুগত্য না থাকায় কর্মক্ষেত্রগুলোতেও চলছে অরাজকতা। মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি ছাড়া এ শিল্পকারখানা ও কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার প্রতিরোধ অসম্ভব। আল্লাহভীতির মাধ্যমেই ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টিসহ মানুষের সকল প্রকার মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন। আমীন।

**তথ্যপঞ্জি**


১. Seebolon Rountree, 'Poverty and Progress' London (১৯৪১)-এর তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক 'সেমিনার স্মারকগ্রন্থ' বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (২০০৩-২০০৫)-এ 'ক্ষুদ্র ঋণ' বিষয়ক একটি প্রবন্ধে প্রাপ্ত, ১১৭ পৃষ্ঠা।

২. 'ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ', 'সেমিনার স্মারকগ্রন্থ' বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (২০০৩-২০০৫), ১১৮ পৃষ্ঠা।

৩. পূর্বোক্ত সূত্র, ১২০ পৃষ্ঠা।

৪. সূরা আশ-শুয়ারা ১১১।

৫. সূরা সাবা ৩৫।

৬. সূরা আল-আনআম ১৬৫।

৭. সূরা যুখরুফ ৩২।

৮. সূরা সাবা ৩৬।

৯. 'তাফহীমুল কুরআন', সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদ, আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৬শ সংস্করণ ২০০৪, সূরা সাবা, ৫৬ টীকা।

১০. সূরা আল-ফাজর ১৫-১৬।

১১. সূরা ত্বাহা ১২৪, নাহল ১১২।

১২. সূরা আল-মা'আরিজ ১৯-২২।

১৩. সূরা বনী ইসরাইল ৩১।

১৪. বুখারী ও মুসলিমের তথ্যসূত্রে রিয়াদুস সালেহীন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২য় খণ্ডে, ৪৮৮ ও ৪৮৯ নং হাদীস এবং রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ডে, ২৫২-২৫৮ নং হাদীস।

১৫. 'ইসলামী অর্থনীতি', সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী শতাব্দী প্রকাশনী, ২৬ পৃষ্ঠা।

১৬. আবু দাউদ শরীফ।

১৭. সূরা আল বালাদ ৮-১৮, সূরা আল-লাইল ৫-৭, সূরা আল বাকারা ২-৩।

১৮. সূরা মুদ্দাসির ৪০-৪৪, সূরা লাইল ৮-১০, সূরা ফাজর ১৭-১৯, সূরা মাউন ৭।

১৯. সূরা আল-মুযযামমিল ২০, সূরা হামীম আস-সাজদা ৬-৭, রুম ৩৯।
২০. সূরা আল-বাকারা ১১৭, ২৬৪, ২৬৭ ও ২৭১, দাহর ৮-৯, আল লাইল ১৭-২০, নাহল ৯০।
২১. সূরা আল-আনআম ১৪১।
২২. সূরা মা'আরিজ ২৪-২৫।
২৩. 'তাফহীমুল কুরআন', সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, মা'আরিজ, ১৬নং টীকা।
২৪. বুখারী ও আবু দাউদের তথ্যসূত্রে রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ডে, ২৭১ ও ২৭২ নং হাদীস।
২৫. বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।
২৬. বুখারী ও মুসলিম।
২৭. 'ইসলামী অর্থনীতি', সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (শতাব্দী প্রকাশনী) ১০২ পৃষ্ঠা।
২৮. পূর্বোক্ত ৮৪ পৃষ্ঠা।
২৯. পূর্বোক্ত ৮৪ পৃষ্ঠা।
৩০. বুখারী ও মুসলিম।
৩১. বুখারী ও মুসলিমের তথ্যসূত্রে রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ডে, ২৬৪ নং হাদীস।
৩২. তাফসীর 'ফি যিলালিল কুরআন', সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল-বাকারা ২১৯ আয়াতের তাফসীর।
৩৩. 'আহকামুল কুরআনের' তথ্যসূত্রে পূর্বোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত।
৩৪. কবীরা গোনাহ, ইমাম আযযাহরী বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পরিশিষ্ট নং ১৪, রাহে আমল জলীল আহসান নদভী খণ্ড ৯, হাদীস নং ১০২-১০৪, রেনেসা পাব: বগুড়া।
৩৫. বুখারীর তথ্যসূত্রে রিয়াদুস সালেহীন ২য় খণ্ড, ৬০০ নং হাদীস।
৩৬. মুসলিমের তথ্যসূত্রে পূর্বোক্ত গ্রন্থে, ৫৪২ নং হাদীস।
৩৭. সূরা আল কাসাস (২২-২৮) আয়াত।
৩৮. রিয়াদুস সালেহীন ২য় খণ্ড, ৫২২-৫৪৩ নং হাদীস।
৩৯. মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ স., নঈমসিদ্দীকী, শতাব্দি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০৩ ও ৫৫০ পৃষ্ঠা।
৪০. দৈনিক সংগ্রাম, ২২ নবেম্বর (২০০৭) ১২ পৃষ্ঠা।
৪১. দৈনিক সংগ্রাম, ২২ নবেম্বর (২০০৭) ১১ পৃষ্ঠা।
৪২. শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মৎস্য মেলা, ২০০৭ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার।
৪৩. 'ম্যান দি আননোন' গ্রন্থের তথ্যসূত্রে 'বর্তমান সভ্যতার সংকট', এ.কে.এম. নাজির আহমদ, ৪৬ পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত।
৪৪. 'ইসলামী অর্থনীতি', সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শতাব্দী প্রকাশনী, ৩৭ পৃষ্ঠা।
৪৫. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।
৪৬. মুসলিম, তাবরানী।
৪৭. মুসনাদে আহমদের তথ্যসূত্রে 'আসহাবে রাসূলের জীবন কথা', মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ৫ম খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠা।

৪৮. সূরা হজ্জ ৫, রাদ ৮, ইমরান ৬, ফাতির ১১ ইত্যাদি।

৪৯. মুসলিম খণ্ড ৫, ৩৪০৮-৩৪৩১, নাসাঈ খণ্ড ৩, ৩৩২৯-৩৩৩১; বুখারী খণ্ড ৫, ৪৮২৫-৪৮২৭; বুখারী খণ্ড ৬, ৬১৪২; তিরমিযী খণ্ড ৪, ২০২৬, ২০২৭; মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক খণ্ড ২, দুধপান রেওয়ায়াত, ১৬; দাউদ খণ্ড ৫, ৩৮৪২; ইবনে মাজা খণ্ড ২, ২০১১; হাদীস শরীফ (৩য় খণ্ড), আব্দুর রহীম, ১৯০-২০০ পৃষ্ঠা; আবু দাউদ খণ্ড ৩, ২১৬৭-২১৭০।

৫০. মুসলিম খণ্ড ৫, ৩৪০৮-৩৪২৬ এবং ৩৪২৮-৩৪৩১।

৫১. নাসাঈ খণ্ড ৩, ৩৩২৯; আবু দাউদ খণ্ড ৩, ৩৮৪২; মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক খণ্ড ২, দুধপান রেওয়ায়েত, ৯৬; তিরমিযী খণ্ড ৪, ২০২৬, ২০২৭; মুসলিম খণ্ড ৫, ৩৪২৮-৩৩১।

৫২. মুসলিম (৫) ৩৪২৯, ৩৪৩০।

৫৩. ইমার ও ডাকী'র 'Life and money'-এর 'Econimic Muddle' অধ্যায়ের সূত্রে 'ইসলামের দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদ', আব্দুল খালেক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৩ পৃষ্ঠা।

৫৪. সূরা আল-বাকারা ২০৪, ২০৫।

৫৫. সূরা আল আহযাব ৩৩।

৫৬. 'তাফহীমুল কুরআন', সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত সূরা আহযাব, ৪৮ টীকা।

৫৭. 'প্রিয় বোন, পর্দা কি, কেন পর্দা কর না'। শায়েখ ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল ও আবদুল হামিদ আলবেলালী, খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

৫৮. রাসায়েল-মাসায়েল (৪র্থ খণ্ড), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। পৃষ্ঠা ১৬৬, মওদূদী একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫ ইং।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ৯১-১০০

# *ন্যায়বিচার সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য*

*মুহাম্মদ মূসা*

হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী সারা রা. হযরত লূত আ.-এর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাঁর এক দাসকে পাঠান। সে সাদূম জনপদে পৌঁছলে তথাকার এক ব্যক্তি তার মাথায় প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে রক্তাক্ত করে এবং বলে, এই রক্ত তোমার দেহের মধ্যে থাকলে তোমার ক্ষতি হতো। অতএব আমাকে তোমার দেহ থেকে রক্ত বের করার পারিশ্রমিক দাও। লোকটি তাকে বিচারকের আদালতে হাজির করলে বিচারক রায় প্রদান করে, 'আহত ব্যক্তি সাদূমীকে তার মাথায় প্রস্তর নিক্ষেপ ও রক্তপাত করার পারিশ্রমিক প্রদান করবে।'

আগন্তুক উপায়ান্তর না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে বিচারকের মাথা ফাটিয়ে বলে, "আমি যে তোমার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তোমাকে রক্তাক্ত করেছি তার পারিশ্রমিক সাদূমীকে প্রদান করো" এবং সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।[১] লূত জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাদের বিচারালয় এ ধরনের রায় প্রদান করতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরসহ তাদের বসতি এলাকাকে উল্টিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাদের ধ্বংস করেন।[২]

বস্তুত ন্যায়বিচার একটি সমাজ ব্যবস্থার রক্ষাকবচ, প্রাণদায়ী শক্তি। ন্যায়বিচারের দণ্ডটি শক্তিশালী ও অনন্যনিরপেক্ষ থাকলে শাসক-শাসিত কেউই সীমালংঘন করতে উদ্যত হয় না। কেউ অধিকার বঞ্চিত হয় না। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে না। প্রত্যেকেই মনে করে যে, তার জুলুমের, বঞ্চনার শিকার হওয়ার আশঙ্কা নেই। তার একটি গ্যারান্টিযুক্ত আশ্রয়স্থল আছে। রাজাও তার উপর জুলুম করতে পারবে না, প্রজাও তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছেন আল-কুরআন। নবুওয়াত লাভের পর হযরত মুহাম্মাদ স. মানব সমাজে ন্যায়বিচার

---

লেখক ঃ একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা।

প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি অনুভব করেন যে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ইসলামের অন্যতম মূল লক্ষ্যই হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। অতএব তোমরা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।"[৩]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوّمِيْنَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ানুগ সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকো। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর।"[৪]

اِنَّ اللّهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার প্রাপককে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৫]

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"আর তুমি যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[৬]

اِنَّ اللّٰهَ يَـأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-ইনসাফ ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।"[৭]

فَـاِنْ فَـا ءَتْ فَـاَصْلِحُـوْا بَيْنَهُـمَـا بِالْعَـدْلِ وَاَقْـسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।"[৮]

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ স.-কে বলেন ঃ

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَّاُمِرْتُ لاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ.

"আর বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি।"[৯]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশসমূহ জানা যায় ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (২) ন্যায়বিচার করার জন্য বিচারকগণকে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। (৩) মোকদ্দমার পক্ষবৃন্দের মধ্যে বিচারক নিজে, তার পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় অথবা এক পক্ষ প্রভাবশালী এবং অপর পক্ষ দুর্বল হলেও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না, অনন্যনিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করতেই হবে। এ যেন ভয়ংকর যুদ্ধ চলাকালে শত্রুকে পরাস্ত করার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (৪) বিচারপ্রার্থী শত্রুপক্ষের, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন মতের, ভিন্ন দলের, ভিন্ন গোষ্ঠীর হলেও ন্যায়বিচার করতেই হবে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। যে বিচারক এই মানদণ্ড রক্ষা করে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁকে তাঁর আরশের নিচে আশ্রয় দিবেন।

রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ومن حكم به عدل "যে ব্যক্তি কুরআনের সাহায্যে বিচার মীমাংসা করলো সে ন্যায়বিচার করলো।"[১০]

**ন্যায়বিচার ও নীতিবোধ**

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকালেও রাসূলুল্লাহ স. বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে নৈতিক উপদেশ দান করেছেন এবং আখেরাতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কারণ ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি বাদী-বিবাদীর সত্য ভাষণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বিচারকের বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এর ব্যত্যয় ঘটলে যে কোন পক্ষ ইনসাফ বঞ্চিত হতে পারে। মহানবী স. বলেন ঃ

انكم تختصمون الى وانما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا ياخذها.

"নিশ্চয়ই তোমরা আমার নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকো। নিশ্চয়ই আমিও একজন মানুষ। হয়ত তোমাদের এক পক্ষ তার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অপর পক্ষ অপেক্ষা অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তোমাদের কারো অনুকূলে তার ভ্রাতার (প্রতিপক্ষের) প্রাপ্য অংশের ফয়সালা প্রদান করলে (সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে) এমতাবস্থায় আমি তাকে দোযখের একটি টুকরাই কেটে দিচ্ছি। অতএব (যথার্থ বিষয় জ্ঞাত থাকলে) সে যেন এর কিছুই গ্রহণ না করে।[১১]

আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল র. থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি এবং কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রথমে হাদরামী বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার কিছু জমি জবরদখল করে রেখেছে। কিনদী বললো, তা আমার জমি, আমার দখলে আছে এবং তাতে তার কোনও স্বত্ব নেই। নবী স. হাদরামীকে বললেন, তোমার সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার প্রতিপক্ষের শপথের উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটি বদমাশ প্রকৃতির, যে কোনও ব্যাপারে শপথ করতে তার দ্বিধা নেই। কোনও কিছুতে তার ভীতি-বিহ্বলতা নেই। তিনি বললেন, এটা ব্যতীত তোমার বিকল্প কোনও পথ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, কিনদী শপথ করতে অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে যদি অন্যায়ভাবে প্রতিপক্ষের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে তাহলে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।[১২]

**ন্যায়বিচার ও রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী**

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শুধু পার্থিব জীবনকেই সাফল্যমণ্ডিত করে না, আখেরাতের জীবনকেও অতীব সৌভাগ্যময় করে। মহানবী স. ন্যায়পরায়ণ শাসক সম্পর্কে বলেন ঃ

سبعة يظلهم الله يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل...

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়াই (আশ্রয়) অবশিষ্ট থাকবে না ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক...."।[১৩]

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم.

"তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, রোযাদারের ইফতারের সময়কার দু'আ এবং মজলুমের দু'আ"।১৪

ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر.

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে জালেম শাসকই হবে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী"।১৫

**ন্যায়বিচারকের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য**

রসূলুল্লাহ স. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি এতই গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, বিচারকগণকে সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের বিশেষ পুরস্কারের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر.

"বিচারক যখন ফয়সালা করে এবং ইজতিহাদ করে (চিন্তা-ভাবনা করে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে), অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তার জন্য দুইটি পুরস্কার এবং সে তাতে ভুল করলেও একটি পুরস্কার পাবে"।১৬

মহানবী স. হযরত সা'দ রা.-এর উদ্দেশে বলেন ঃ

يا سعد فاتق الله عند حكمك اذا حكمت وعند قسمك اذا قسمت وعند همك اذا هممت.

"হে সা'দ! তুমি যখন বিচার-ফয়সালা করবে, ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে"।১৭

রসূলুল্লাহ আরো বলেন ঃ

ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وما ولوا.

"ন্যায়বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) দয়াময় মহামহিম আল্লাহর ডানপাশে আলোর মিনারসমূহে অবস্থান করবে, যদিও তাঁর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত, যারা তাদের বিচারকার্যে, শাসনকার্যে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালনে সুবিচার করে"।[১৮]

**ন্যায়নীতিহীন বিচারকের পরিণতি**

রসূলুল্লাহ স. ন্যায়বিচারকের যেমন উচ্চ মর্যাদা ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী বিচারকগণের দোযখবাসী হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ان الله مع القاضى ما لم يجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিচারকের সঙ্গে থাকেন যাবত না সে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়। সে অন্যায় করলেই আল্লাহ তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে আকড়ে ধরে"।[১৯]

القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فاما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهى النار.

"বিচারকগণ তিন শ্রেণীভুক্ত, একজন জান্নাতী এবং দুইজন দোযখী। জান্নাতী বিচারক সেই ব্যক্তি যে যথার্থ সত্য উপলব্ধি করে তদনুসারে রায় প্রদান করে। আর যে বিচারক যথার্থ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও অন্যায় রায় দেয় সে দোযখী। আর যে বিচারক মোকদ্দমার পক্ষবৃন্দের মধ্যে অজ্ঞতা প্রসূত রায় দেয় সেও দোযখী'।[২০]

**ন্যায়বিচারের পন্থা**

মহানবী স. হযরত আলী রা.-কে বলেন, যখন দুই ব্যক্তি তোমার নিকট বিচার প্রার্থনা করে তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনেই প্রথম ব্যক্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে রায় দিও না। অচিরেই তুমি জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফয়সালা করছো।[২১]

عن ابن عاس ان النبى ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وامو الهم ولكن اليمين على المدعى عليه.

"ইব্‌ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, লোকজনকে তাদের দাবি অনুযায়ী (সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া) ফয়সালা দেয়া হলে অবশ্যই কতক লোক অন্য লোকের জীবন (মৃত্যুদণ্ড) ও সম্পদ দাবি করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকেই শপথ করতে হবে"।[২২]

عن ابى هريرة قال لعن رسول الله ﷺ الراشى والمرتشى فى الحكم.

"আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিচারকার্যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে অভিসম্পাত করেছেন"।[২৩]

**আইনের চোখে সকলেই সমান**

ধনী-নির্ধন, প্রভাবশালী-প্রভাবহীন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র সকলেই আইনের চোখে সমান। এখানে কারো ব্যক্তিত্ব ন্যায়বিচারে বাধা হতে পারে না। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের প্রতি বিচারকের সমান দৃষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبٰى.

"তোমরা কথা বললে ন্যায্য বলবে–তা আপনজনদের সম্পর্কে হলেও"।[২৪]

মক্কা বিজয়কালের ঘটনা। মাখযূম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরি করে ধরা পড়লে কুরায়শরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে রসূলুল্লাহ স.-এর একান্ত স্নেহাস্পদ উসামা রা.-কে দণ্ড মওকুফের সুপারিশ করার জন্য তাঁর নিকট পাঠায়। তাঁর কথায় রসূলুল্লাহ স. খুবই রুষ্ট হন এবং বলেন, তুমি কি আল্লাহর বিধান কার্যকর না করার সুপারিশ করছো! অতঃপর তিনি লোকজনকে সমবেত করে ভাষণ দেন এ বং বলেন ঃ

اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন প্রভাবশালী লোক চুরি করলে তারা তাকে শাস্তি না দিয়ে রেহাই দিতো; পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম"।[২৫]

**কেবল অপরাধীই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী**

ন্যায়বিচারের দাবি হলো, যে ব্যক্তি অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হয়েছে এর জন্য কেবল সে-ই দায়ী হবে, অপর কেউ নয়। ইসলামী আইনের এটিই মূলনীতি। জাহিলী আরব সমাজে একজনের অপরাধের শাস্তি একাধিকজন ভোগ করতো। আল্লাহ তা'আলা এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করে বলেন ঃ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرى.

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অপরের ভার বহন করবে না"।[২৬]

فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

"জালেমদের ব্যতীত অন্য কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না"।[২৭]

كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ.

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ

"প্রকাশ্যে অপরাধকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের সকলে নির্দোষ"[২৮]

اَلاَ لاَ يَجْنِىْ جَانٍ اِلاَّ عَلى نَفْسِهِ وَلاَ يَجْنِىْ وَالِدٌ على وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلى وَالِدِهِ.

"সাবধান! অপরাধী তার নিজের বিরুদ্ধেই অপরাধ করে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না"।[২৯]

**অপরাধীকে ক্ষমা করার সুযোগ**

কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ গোপন রাখার অথবা তার অপরাধ ক্ষমা করার সুযোগ আছে। আল্লাহর অধিকারের পরিধির মধ্যে সংঘটিত গুরুতর অপরাধ, যার ফলে অপরাধীর জীবনহানি ঘটতে পারে, যদি প্রকাশ্যে সংঘটিত না হয়ে থাকে তবে তা গোপন রাখার সুযোগ আছে, বিশেষ করে যেনার অপরাধ। যেমন মায়েয ইব্‌ন মালেক আল-আসলামীকে যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পর রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, "হে হায্‌যাল! যে অপরাধ আল্লাহ তাঁর চাদরে ঢেকে রেখেছিলেন, তুমি তা ঢেকে রাখলে না কেন"?

অনুরূপভাবে অপরাধটি যদি একান্তই কারো ব্যক্তিগত অধিকারের পরিধির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব

পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এক ব্যক্তি তার চাদর তার মাথার নিচে দিয়ে কা'বার চত্বরে ঘুমাচ্ছিল। এই সুযোগে একটি লোক নিঃশব্দে তার চাদরটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই নিদ্রিত ব্যক্তি টের পেয়ে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আদালতে সোপর্দ করা হলে তিনি তার শাস্তি ঘোষণা করেন। বাদী বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! চাদরটি আমি তাকে দান করলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমার এখানে সোপর্দ করার পূর্বে তুমি তাকে ক্ষমা করলে না কেন?

এ ধরনের অনেক অপরাধ আছে, যে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপরাধীকে আদালতে সোপর্দ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমা করার সুযোগ পায়। নরহত্যার অপরাধ তো বাদী পক্ষ বিচারকের রায়দানের পরও ক্ষমা করতে পারে।

**তথ্যপঞ্জি**


১. আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিক্র, বৈরূত, তা.বি., পৃ. ১১২।
২. আল-কুরআন, ১৫ঃ৭৩-৪, ৫১ঃ৩২-৩৪।
৩. আল-কুরআন, ৪ঃ১৩৫।
৪. আল-কুরআন, ৫ঃ৮।
৫. আল-কুরআন, ৪ঃ৫৮।
৬. আল-কুরআন, ৫ঃ৪২।
৭. আল-কুরআন, ১৬ঃ৯০।
৮. আল-কুরআন, ৪৯ঃ৯।
৯. আল-কুরআন, ৪২ঃ১৫।
১০. তিরমিযী, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন, বাব মা জাআ ফী ফাদলিল কুরআন, নং ২৯০৬; সুনান আদ-দারিমী, কিতাব ফাদাইলিল-কুরআন, বাব ১, নং ৩৩৩১।
১১. তিরমিযী, আহকাম, বাব মা জাআ ফিত-তাশদীদি আলা মান...., নং ১৩৩৯; বুখারী কিতাবুল মাজালিম, বাব ইছমি মান খাসামা ফী বাতিল...., নং ২৪৫৮, আরও বহু স্থানে; মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, বাব বায়ানি আন্না হুকমাল হাকিম...., নং ৪৪৭৫/৫; আবূ দাঊদ, কিতাবুল কাদা, বাব ফী ফাদাইল কাদী ইযা আখতাআ, নং ৩৫৩৮; নাসাঈ, কুদাত, বাব ১২ ও ৩৩; ইব্ন মাজা, আহ্কাম, বাব ৫)।
১২. তিরমিযী, আহকাম, বাব মা জাআ ফী আন্নাল-বায়্যিনাতা আলাল-মুদ্দাঈ, নং ১৩৪০; আবু দাঊদ, কিতাবুল কাদা, বাবুর-রাজুলি ইয়াহলিফু আলা ইলমিহি, নং ৩৬২২)।
১৩. তিরমিযী, যুহদ, বাব মা জাআ ফিল-হুব্বি ফিল্লাহ, নং ২৩৯০; বুখারী, হুদূদ, বাব ফাদলি মান তারাকাল ফাওয়াহিশ, নং ৬৮০৬; নাসাঈ, কুদাত, বাব ইমাম আদিল, নং ৫৩৮২)।

১৪. তিরমিযী, জান্নাত, বাব সিফাতিল জান্নাত, নং ২৫২৬; বুখারী, আযান, বাব মান জালাসা ফিল-মাসজিদ, নং ৬৬০, যাকাত, বাবুস-সাদাকা বিল-ইয়ামীন, নং ১৪২৩, হুদূদ, বাব ফাদলি মান তারাকাল-ফাওয়াহিশ, নং ৬৮০৬; ইব্‌ন মাজা, সিয়াম, বাব ফিস-সাইম লা তুরাদ্দু...., নং ১৭৫২।

১৫. তিরমিযী, আহ্‌কাম, বাব মা জাআ ফিল-ইমামিল আদিল, নং ১৩২৯।

১৬. বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, বাব আজরিল হাকিম, নং ৭৩৫২; তিরমিযী, আহকাম, বাব মা জাআ ফিল-কাদী...., নং ১৩২৬; মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, বাব বায়ানি আজরিল হাকিম, নং ৪৪৮৭/১৫; আবূ দাউদ, কিতাবুল আকদিয়া, বাব ফিল-কাদী ইউখতি, নং ৩৫৭৪; নাসাঈ, আদাবুল কুদাত, বাব আল-ইছবাতু ফিল-হুকমি, নং ৫৩৮৩।

১৭. ইবন মাজা, যুহদ, বাব ১, নং ৪০৪।

১৮. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাব ফাদীলাতিল ইমাম আল-আদিল, নং ৪৭২১/১৮; নাসাঈ, কিতাব আদাবিল কুদাত, বাব ফাদলিল হাকিমিল আদিল, নং ৫৩৮১; মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ১৬৮, নং ৬৪৯২।

১৯. তিরমিযী, আহকাম, বাব মা জাআ ফিল-ইমামিল-আদিল, নং ১৩৩০; আরও দ্র. ইব্‌ন মাজা, আহ্‌কাম, বাব আত-তাগলীজ ফিল-হায়ফ ওয়ার-রিশওয়াতি, নং ২৩১২।

২০. আবূ দাউদ, কিতাবুল কাদা, বাব ফিল-কাদী ইউখতি, নং ৩৫৭৩; ইবন মাজা, আহকাম, বাব ফিল-হাকিম ইয়াজতাহিদু...., নং ২৩১৫।

২১. তিরমিযী, আহ্‌কাম, বাব ৫, নং ১৩৩১।

২২. মুসলিম, আকদিয়া, ১ম বাব, নং ৪৪৭০/১; নাসাঈ, আদাবুল কুদাত, বাব 'ইযাতুল হাকিম আলাল-ইয়ামীন, নং ৫৪২৭; ইবন মাজা, আহকাম, বাব আল-বায়্যিনাত আলাল-মুদ্দাঈ, নং ২৩২১।

২৩. তিরমিযী, আহকাম, বাব মা জাআ ফির-রাশী..., নং ১৩৩৬।

২৪. আল-কুরআন, ৬ঃ১৫২।

২৫. বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৫৪, নং ৩৪৭৫, আরও বহু স্থানে; মুসলিম, হুদূদ, নং ৮-৯; আবূ দাউদ, বাব ৪ ও ২৫; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ৬; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ৬; ইব্‌ন মাজা, হুদূদ, বাব ৬; দারিমী, হুদূদ, বাব ৫।

২৬. আল-কুরআন, ৬ঃ১৫২।

২৭. আল-কুরআন, ২ঃ১৯৩।

২৮. বুখারী, বাব সিতরিল-মুমিন আলা নাফসিহি, নং ৬০৬৯।

২৯. সুনান ইব্‌ন মাজা, মানাসিক, (৭৬) বাবুল খুতবাতি ইয়াওমান নাহরি, নং ৩০৫৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা : ১০১-১১৪

# শিশু আইন ১৯৭৪ ঃ একটি আইনানুগ পর্যালোচনা

নাহিদ ফেরদৌসী

**ভূমিকা ঃ** আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। শিশুদের উপর আগামীর সমাজ ব্যবস্থা নির্ভর করে এবং ভবিষ্যতে তাদের উপর আমাদের সমাজ টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব বর্তায়। তারা জীবন ধারণ ও বড় হওয়ার পথে অভিভাবক, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন এমনকি পাড়া প্রতিবেশীদের উপর নির্ভরশীল হয়। শিশুদের জীবনের বিভিন্ন ধাপ ও বেড়ে উঠার সময়ের প্রকৃতি বড়দের জীবন থেকে আলাদা। তাদের চাহিদা এবং বেড়ে উঠার সময়কার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাও ভিন্ন। শিশুরা খুব সহজেই পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে। তারা কোন কিছু গভীরভাবে ভাবতে পারে না, ভাবেও না। তাই নানা কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং অপরাধ করে।[১] বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি যা সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ।[২] এসব শিশু কিশোরদের অপরাধের বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ ও ধরন এবং তাদের অধিকার, মানবিক মর্যাদা, সংশোধণের সুযোগ ও অন্যান্য কল্যাণকর দিকসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন। তারা যখন আইনের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় বা কোনো অপরাধে জড়িত হয় তখন তাদেরকে ভিন্ন মানদণ্ডে, বিশেষ নীতি বা আদর্শের আলোকে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন, যাতে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।[৩] উল্লিখিত চিন্তা চেতনার আলোকে অপরাধে জড়িত শিশুদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, সংশোধন, সামাজিকভাবে উন্নয়ন এবং অন্যান্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে "শিশু আইন" প্রবর্তন করা হয়। অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের বিচার, সংশোধন, শাস্তি, নিরাপত্তা এবং হেফাজতের জন্য পূর্বের সকল আইন সমন্বিত ও সংশোধন করে 'শিশু আইন, ১৯৭৪' প্রণীত হয়।

শিশু আইন ১৯৭৪ শিশু -কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ বিষয়ক একটি ব্যাপকভিত্তিক আইন যার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য: একবার অপরাধের জন্য শিশুটি যেন চিরদিনের জন্য অপরাধী হিসেবে পরিগণিত না হয়।[৪] এ আইনে অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচের বয়সী শিশু কর্তৃক যে কোনো অপরাধ কিশোর অপরাধ ও এ ধরণের অপরাধকাজে জড়িত শিশুদের 'কিশোর অপরাধী' (ইয়ুথফুল অফেন্ডার) বলে এবং এরা শাস্তির পরিবর্তে

---

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সংশোধনের সুযোগ পায়।[৫] পৃথক কিশোর আদালত গঠন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে অপরাধ করা সত্ত্বেও তাদের সাথে শিশুদের যৌথ বিচার রোধ করে এ আইনু। তবে আদালত কর্তৃক আদেশ দানের পূর্বে অবশ্যই শিশুর বয়স, চরিত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়। এছাড়া যে সকল শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক মাদকাসক্ত, যে সকল শিশু প্রায়ই অবহেলিত, নির্যাতিত, ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে খারাপ আচরণের শিকার তাদেরসহ দুঃস্থ অবহেলিত শিশুদের যত্ন এবং নিরাপত্তাও বিধান করে এ আইন।[৬] চৌত্রিশ বছর আগে এ আইনটি প্রণীত হলেও বাংলাদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধের বিচার, সংশোধন ও শাস্তির বিষয়ে এটি একমাত্র আইন। তাই শিশু ও কিশোর অপরাধ নিরসনের ক্ষেত্রে এ আইনের গুরুত্ব সর্বাধিক। পরবর্তীতে শিশু আইনের বাস্তবায়নের ধরন নির্দিষ্ট করার জন্য ১৯৭৬ সালে শিশু বিধি প্রণীত হয়।

এ প্রবন্ধটিতে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের উদ্দেশ্য, পরিধি, অস্পষ্ট ধারাসমূহ বিশ্লেষণ, পদ্ধতিগত জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার প্রয়োজনেই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

## শিশু আইন প্রণয়নের পূর্বের ইতিহাস

শিশু আইনটি প্রণয়নের আগে ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অভ অফেন্ডারস অর্ডিন্যান্স (১৯৬৪ সালে সংশোধিত)' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোনো শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে জেলখানায় রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিম্ন ১ সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।[৭] অবশ্য প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদেরও প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে আছে। তবে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রবেশন অর্ডিন্যান্সের পর ১৯৭৪ সালে দেশে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণীত হয় যেখানে এ প্রবেশন ব্যবস্থা কার্যকরী করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮] রিফরমেটরি স্কুল আইন ১৮৯৭, বেঙ্গল চিলড্রেন এ্যাক্ট ১৯২২, প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ ইত্যাদি আইনের ধারাবাহিকতায় শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিকাশ ঘটে। এ আইনের দ্বারা পূর্ববর্তী চিলড্রেন এ্যাক্ট ১৯২২ এবং রিফরমেটরি স্কুলস এ্যাক্ট ১৮৯৭ রহিত হয়েছে।[৯] পরবর্তীতে শিশু আইনের আওতায় ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রণীত হয়। আমাদের দেশের এ শিশু আইন জেনেভা ঘোষণার উপর ভিত্তি করে প্রণীত।[১০]

## শিশু আইন, ১৯৭৪

শিশু আইনটি ১৯৭৪ সালের ২১ জুন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ২২ জুন ৩৯ নং আইন আকারে গেজেটে প্রকাশিত হয়। এ আইন শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য প্রণীত, যা

১৯৭৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১লা জুন থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ হয়েছে।[১১]

এ আইনে শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ আইনগত স্বার্থ সন্নিবেশনের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আইনটিতে পদ্ধতিগত এবং বাস্তব উভয় উপাদান বিদ্যমান। পদ্ধতিগত উপাদান ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির দ্বারা সমর্থিত। এতে কিশোরদের বিচারের জন্য বিশেষ পদ্ধতির আদালত এবং শিশুদের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সুবিধা প্রদানের বিষয়সমূহ বিবৃত হয়েছে।[১২]

**শিশু আইনের উদ্দেশ্য**

এ আইনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের ক্ষমতায়ন। শিশুদের সুরক্ষা ও পরিচর্যা আইনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। শিশু অপরাধীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় তাদের বিচার পরিচালনায় স্বভাবতই নমনীয় মনোভাব পোষণ করে 'শাস্তি নয় সংশোধন, পরিচর্যা, হেফাজত, রক্ষণ ও কল্যাণ সাধন' নীতি হচ্ছে এ আইনের উদ্দেশ্য।[১৩]

২. শিশু অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে, শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন ও পরিচর্যার সুযোগ দিয়ে শিশুকে সমাজে পুনর্বাসনকরণ।

৩. শিশু আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে শিশুদের সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়।[১৪] এ আইন মোতাবেক অপরাধী কিশোরদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে টংগী, গাজীপুর ও যশোরে ৩টি 'জাতীয় সংশোধনী ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হয়েছে। শিশু অপরাধীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং অবাধ্য শিশুদের পরিচর্যা হেফাজত ও পুনর্বাসনে এসব জাতীয় সংশোধনী ইনস্টিটিউট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।[১৫]

**শিশু আইনের পরিধি**

শিশু আইনটিতে মোট ৭৮টি ধারা ও দশটি অধ্যায় আছে। এ আইনে কিশোর আদালতে আনা হতে পারে এমন চার শ্রেণীর শিশুদের এবং তাদের বিচারের অবকাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে।[১৬] এ শ্রেণীগুলো হল-

- দু:স্থ ও অবহেলিত শিশু,
- কোনো অপরাধে অভিযুক্ত শিশু-কিশোর,
- অভিভাবক বা পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু,
- অপরাধের শিকার শিশু।[১৭]
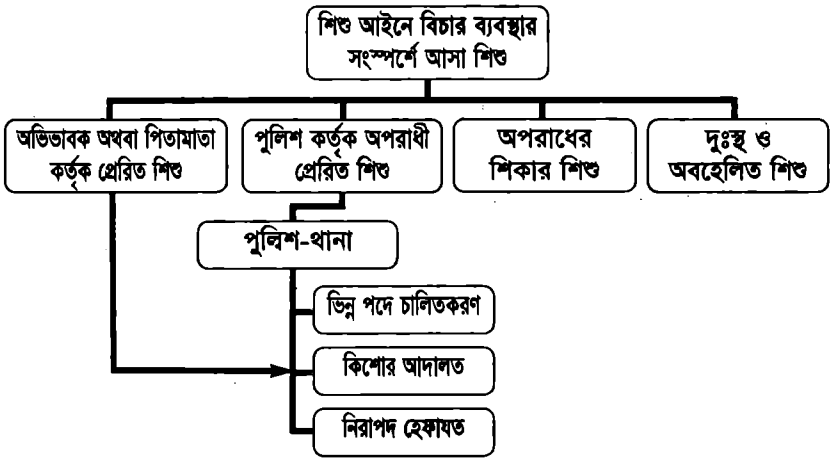
**শিশু আইনের উল্লেখযোগ্য যে বিষয়সমূহ শিশু অপরাধীর স্বার্থ রক্ষায় বিশেষভাবে কার্যকর**

১. শিশুর সংজ্ঞা

ধারা ২: আমাদের দেশে শিশু আইন অনুযায়ী ১৬ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েরা শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের গ্রেপ্তার, জামিন, হাজতবাস ও বিচার প্রক্রিয়া শিশু আইনের ধারা মোতাবেক হবে এবং তারা শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

২. কিশোর আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার

ধারা ৪: শিশু-কিশোরদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার কিশোর আদালতে কিংবা কিশোর আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহে নিষ্পন্ন হবে।

৩. শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কের পৃথক বিচার ব্যবস্থা

ধারা ৬: শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা থাকবে, তাদের একসাথে বিচার করা যাবে না। একই দালানে এবং একই সময়ে তাদের বিচার করা আইনানুগ নয়।

৪. শিশু অপরাধীদের বিচার্য বিষয়

ধারা ১৫: শিশু অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে শিশুর চরিত্র ও বয়স, শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ, প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট প্রভৃতি বিষয় আদালত বিবেচনা করবেন।

৫. মামলায় জড়িত শিশুর ছবি প্রকাশ নিষিদ্ধ

ধারা ১৭: সাধারণভাবে আদালতে বিচারাধীন শিশুর মামলার বিষয় বা ছবি (শিশু স্বার্থের পরিপন্থী হলে) সংবাদপত্র বা কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না।

৬. শিশুর প্রতি নির্যাতন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ

ধারা ৩৪: শিশুর প্রতি যে কোন ধরনের শোষণ, নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন করা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭. গ্রেফতারকৃত শিশুর জামিন

ধারা ৪৮: শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী না হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানা থেকেই গ্রেফতারকৃত শিশুকে জামিনে খালাস দিতে পারেন।

৮. জামিনের অযোগ্য শিশুর হেফাজত

ধারা ৪৯: জামিনের অযোগ্য কোনো অপরাধ করলে শিশুকে রিমান্ড হোম বা কিশোর হাজত কিংবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে আটক রাখতে হবে।

৯. গ্রেফতারকৃত শিশুর অভিভাবককে অবহিতকরণ

ধারা ৫০: গ্রেফতারকৃত শিশুর কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্যই শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে এবং প্রবেশন অফিসারকে এরূপ গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১০. শিশু শাস্তি নিষিদ্ধকরণ

ধারা ৫১: অন্য কোনো আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।

১১. শিশুকে দোষী সাব্যস্ত নিষিদ্ধকরণ

ধারা ৭০: শিশু কোনো অপরাধ করলে সে কারণে পরবর্তীতে তার চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তা অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচ্য হবে না বা তাকে আসামি বলা বা দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।[১৮]

**শিশু আইন, ১৯৭৪ এর পর্যালোচনা**

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিশুদের ক্ষমতায়নই এর মূল উদ্দেশ্য। এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অনেকগুলো বিধান আইনটিতে রাখা হয়েছে।[১৯] কারণ আইনের একটি দিক শাসন আর অন্যটি প্রতিপালন। শিশুর ক্ষেত্রে শাসনের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রতিপালনের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়।[২০] ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটি প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে পাশ হয়েছে। আইনটি প্রাথমিক ভাবে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ ও তাদের পরিচর্যা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেয়।[২১] এছাড়া যে সকল শিশু অপরাধে জড়িত হয় তাদের বিচার ও শাস্তির প্রক্রিয়ার বিধানও এতে রয়েছে ।[২২] এ আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কিছু বিষয়ে আইনের অস্পষ্টতা ও প্রায়োগিক জটিলতা সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায়। এ আইনটির সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হলো:

**পর্যালোচনা ১: সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা**

শিশু আইনের ১ (ক) ধারায় 'প্রাপ্ত বয়স্ক' অর্থ এরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু নয়। কিন্তু কোন ধরনের আইনের অধীনে 'প্রাপ্ত বয়স্ক' এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ এ শিশু আইনে নেই।

২ (খ) ধারায় 'অনুমোদিত আবাস' বিষয়ে বলা হয়েছে। এর অর্থ এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যা শিশুদেরকে গ্রহণ ও হেফাজত করার জন্য অথবা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিরোধের উদ্দেশ্যে এবং এর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত কোনো শিশুকে তার জন্মগত ধর্মের বিধান মোতাবেক পালন করার

সুযোগ প্রদানের জন্য অথবা ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো সমিতি । অথচ এ আইনের ১২টি ধারাতে 'অনুমোদিত আবাস' এর কথা বলা হয়েছে। আবার অন্যদিকে ১৪ এবং ৭৭ ধারায় 'অনুমোদিত স্থান'- এর উল্লেখ রয়েছে যা সংজ্ঞায় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। একটি আইনে তিন ধরনের আবাসের কথা বলা হলেও তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এতে আইনটি যথাযথ প্রয়োগে সমস্যা দেখা দেয়।

২ (চ) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি এবং প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা আদালত কর্তৃক কোনো আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে সেই শিশু যে তার আটক জেলের পূর্ণ সময়কাল আটক থাকে, উক্ত সময়ে তার বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হলেও। এভাবে শিশু আইনে শিশুকে দুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত: এ আইনের ২ (চ) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৬ বছর বা ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত: এ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারায় শিশুকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা আদালত কর্তৃক কোনো আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে আটক রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৬ বছরের বেশি বয়সীকেও শিশু হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। এভাবে এ আইনে শিশুর সংজ্ঞায় দু'ধরনের বয়সের কথা উল্লেখ রয়েছে।[২৪] দু'ধরনের বয়সের উল্লেখ থাকায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং আইনটি বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়।

২ (ঢ) ধারায় বর্ণিত আছে 'ইয়থফুল অফেন্ডার' অর্থ এরূপ কোনো শিশু যাকে অপরাধ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ আইনে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান উল্লেখ নেই। WHO এর তথ্য অনুযায়ী 'ইয়থফুল অফেন্ডার'-এর বয়সসীমা ১৭ থেকে ২০ বছর। কিন্তু ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সের শিশুরা শিশু আইনের বিচার্য বিষয় নয়।

**পর্যালোচনা ২:কিশোর আদালতের বিচারিক ক্ষমতা ও পদ্ধতিগত জটিলতা**

এ আইনের ৪ ধারায় শিশু আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতা বিষয়ে বর্ণনা আছে যে, কোনো মামলার মূল বিচার বা আপিল বিচার অথবা পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে, হাই কোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, সহকারী দায়রা জজ আদালত, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটও প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু শিশু আইন প্রণয়নের পর আইনটিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়নি। বর্তমানে প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী মহকুমা জেলায় পরিণত হয়েছে এবং কিশোর আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নেই।[২৪] সে অর্থে আমাদের দেশে কোনো পৃথক কিশোর আদালত নেই। এছাড়া আইনটিতে কিশোর আদালতের বিচার কার্য পরিচালনায় অনানুষ্ঠানিক নিয়মরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। একজন অবাধ্য কিশোরকে রাষ্ট্রের পোষ্য হিসেবে গণ্য করে আদালতের বিচারকার্য পরিচালনায় এরূপ অনানুষ্ঠানিক নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। বস্তুত: কোনো কিশোর সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা তা নিরূপণের প্রতি নজর দেওয়া হয় না। ফলে অপরাধী না হয়েও অনেক

কিশোরকে অন্যায়ভাবে সংশোধন কর্মসূচীতে রাখা হচ্ছে। কোনো কিশোর বা শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হবার পর তাকে সংশোধন কর্মসূচীতে রাখা বাঞ্ছনীয়।[২৫] কিন্তু এ আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবে তা দেখা যায় না।

**পর্যালোচনা ৩: কিশোর আদালতের পরস্পরবিরোধী এখতিয়ারের কারণে শিশু অপরাধীদের সুরক্ষা ব্যাহত**

শিশু আইনের ৫ (১) ধারা অনুযায়ী কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য কিশোর আদালত গঠন করা হলে এরূপ আদালত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর মামলার বিচার করবেন এবং এ আইনের অধীনে অন্যান্য বিষয় নিষ্পত্তি করবেন। এ আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় জড়িত কোনো প্রাপ্ত বয়স্কের মামলার বিচারের ক্ষমতা এ আদালতের থাকবে না। এ ধারা অনুযায়ী কিশোর আদালতের দুটি দায়িত্ব রয়েছে।

১) কোনো শিশু যদি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা এবং

২) এ আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য ধারার বিষয়সমূহ যেমন- যেসব শিশুকে পিতামাতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকেও কিশোর আদালতের নির্দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে অনূর্ধ্ব তিন বছর রাখার ব্যবস্থা রয়েছে ।

আবার এ আইনের ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত দুঃস্থ ও অবহেলিত শিশুদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান করা কিশোর আদালতের দায়িত্ব। অতএব কিশোর আদালত শুধুমাত্র অপরাধের সংস্পর্শে আসা শিশুদের ব্যবস্থা করা নয় বরং শিশুদের জন্য ব্যাপক পরিসরে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত।[২৬]

যদিও এ আইনে কিশোর আদালতের পরিধিকে ব্যাপক ও বিস্তৃত রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনটিতে কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা এতই অস্পষ্ট যে কোন্ কিশোর অপরাধীকে কিশোর আদালতের আওতায় আনা যাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই । আবার নির্ভরশীল ও উপেক্ষিত শিশুর দায়িত্ব একই আদালতকে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে উপেক্ষিত ও নির্ভরশীল শিশুদেরকে কিশোর অপরাধীদের সংস্পর্শে আনা ঠিক নয়। এতে আইনটির লক্ষ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।[২৭] আদালতের পরিধি এত ব্যাপক থাকলে প্রকৃত কিশোর অপরাধীদের বিচার ও সংশোধনের প্রতি নজর দেওয়া কঠিন হবে। এমন পরিস্থিতিতে কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।[২৮]

শিশু আইনের ৫ (৩) ধারায় কোনো শিশু আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত দায়রা আদালতের অধঃস্তন এরূপ কোন আদালতের নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে, যে অপরাধে কোনো শিশু অভিযুক্ত হয়েছে তা কেবল দায়রা আদালতেই বিচারযোগ্য, তখন উক্ত মামলাটি অবিলম্বে দায়রা আদালতে, এ আইনে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বদলী করতে হবে।

কিন্তু ৩ ধারায় বর্ণিত আদালতসমূহ অপরাধী শিশুর যে কোনো ধরনের বিচার করার জন্য সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ ৫ এবং ৩ ধারা দুটি পরস্পরবিরোধী। যেহেতু কিশোর আদালত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার বাইরে শিশুদের জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা সেহেতু ফৌজদারী আইন অনুযায়ী এ আইনের এখতিয়ার নির্ধারিত থাকা উচিত নয়।

**পর্যালোচনা ৪: শিশু অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ**

শিশু আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত আছে; আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

(ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স;

(খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ;

(গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট এবং

(ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনা করবে বলে আদালত মনে করে সে সকল বিষয়।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুটি কোনো অপরাধ করেছে, সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে এ মর্মে আদালত তদন্তের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করার পর উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আদালতকে অবশ্যই এ ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আদালত তা বিবেচনায় না এনে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ শুধুমাত্র পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।[২৯]

**পর্যালোচনা ৫: কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের আইনগত কাঠামো ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান**

শিশু আইনের ১৯ ধারায় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যয়ন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

১) সরকার শিশু ও কিশোর অপরাধীদের গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।

২) সরকার প্রত্যয়ন করতে পারবেন যে (১) উপধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত এরূপ কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা কোনো শিশু বিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু-কিশোর অপরাধীদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু এ ধারার ব্যাখ্যায় প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানের যে ভাবমূর্তি (শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক), বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয় না।

এছাড়া এ আইনের ২০ ধারায় হাজতবাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সরকার কোনো আদালত অথবা পুলিশ কর্তৃক হাজতে প্রেরিত শিশুদের আটক রাখা, রোগ নির্ণয় এবং শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যে হাজতাবাস প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কিন্তু রিমান্ড হোম কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের অংশ নয়। অথচ বাস্তবে এটি ইনষ্টিটিউটের সাথে রাখা হয়েছে।

**পর্যালোচনা ৬: কর্মজীবী শিশুর সুরক্ষা ও হেফাজত বিষয়ে অপর্যাপ্ত বিধান**

শিশু আইনের ৪৪ ধারায় শিশু কর্মচারীবৃন্দকে শোষণের দণ্ড প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ,

১) যে ব্যক্তি শিশুকে ভৃত্যের চাকরি অথবা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজে নিয়োগের ভান করে কোনো শিশুকে হস্তগত করে তার নিজ স্বার্থে শিশুটিকে শোষণ করে বা কাজে লাগায়, আটকে রাখে বা তার উপার্জন ভোগ করে, তবে তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২) যে ব্যক্তি (১) উপধারায় বর্ণিত কোনো একটি উদ্দেশ্যের জন্য ভান করে কোনো শিশুকে আয়ত্তে এনে তাকে অসৎ পথে চালিত, সমকাম, পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য নীতি বহির্ভূত

কর্মকাণ্ডে জড়িত করে তিনি দু'বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

কিন্তু শিশু আইনে এ ধারার কোনো বিশদ ব্যাখ্যা নেই। বাংলাদেশের কর্মজীবী শিশুদের সুরক্ষার জন্য এ ধারা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এ বিষয়ের উপর আইনগত বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যাতে বাস্তবে এ আইন প্রয়োগে শিশুর স্বার্থ রক্ষা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। কারণ শিশুরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্জনে অক্ষম। তাই আইনে তাদের স্বার্থ রক্ষার বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

এছাড়া শিশু আইনের ৪৯ (১) ধারায় জামিনে খালাসপ্রাপ্ত হয়নি এরূপ শিশুর হেফাজত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, যে ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৪৮ ধারার অধীনে খালাসপ্রাপ্ত না হন, সেক্ষেত্রে যতদিন তাকে আদালতে হাজির করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তাকে হাজত আবাস অথবা কোনো নিরাপদ স্থানে আটক রাখার জন্য উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৩০]

অথচ ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালতের কোনো বিশেষ আদেশ না থাকলে আটক রাখার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার বেশি হবে না, আটক স্থান হতে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদ বহির্ভূত থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়, যতদিন তাকে আদালতে হাজির করা না যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শিশুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়। ৪৮ ধারা অনুযায়ী শিশুর জামিনের ক্ষেত্রে সমাজের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। তাই শিশু বিধিমালায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। কারণ শিশু আইনে আটক বিষয়ে দু'ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ থাকায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

**পর্যালোচনা ৭ঃ অপরাধী শিশুর শাস্তির অসংগতিপূর্ণ বিধান**

শিশু আইনের ৫১ ধারায় শিশুর শাস্তি বিধানে বাধা নিষেধ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

১) অন্য কোনো আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। তবে শর্ত হলো কোনো শিশুকে যখন এরূপ মারাত্মক ধরনের অপরাধ করতে দেখা যায় এবং এ আইনের অধীনে প্রদান যোগ্য কোনো শাস্তি আদালতের মতে পর্যাপ্ত নয় বা আদালত যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি এত বেশি অবাধ্য যে, তাকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সব আইনানুগ পদ্ধতিতে মামলাটির সুরাহ হতে পারে, সেরূপ কোনো একটিও তার জন্য উপযুক্ত না, তা হলে আদালত শিশুটিকে কারাদণ্ড দান অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ স্থানে বা শর্তে আটক রাখার আদেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, এরূপ আটক থাকাকালে কোনো সময়ে আদালত উপযুক্ত মনে করলে নির্দেশ দিতে পারে যে, এরূপ আটক রাখার পরিবর্তে কিশোর অপরাধীকে, তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে রাখতে হবে।

উল্লেখ্য যে ধারা ৫১ তে বর্ণিত শাস্তি খুবই সীমিত এবং নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধারাটি শুরু হয়েছে 'শিশুদের শাস্তি নিষিদ্ধ' কথাগুলো দিয়ে এবং এ নিষিদ্ধ করার পর ব্যতিক্রম হিসাবে

কোনো কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি শিশুকে অন্তরীণ রাখা যাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২) কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনো কিশোর অপরাধীকে বয়স্ক আসামির সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, আইনটিতে কেবলমাত্র একবার ৫১ ধারাতে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যদিও 'বিচার' শব্দটি অন্তত ৮টি ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আইনটিতে একটিবার 'শাস্তি' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এটা স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, শিশুদের বিচারের সাথে শাস্তির সংশ্লিষ্টতা অনেক কম এবং শিশুদের শাস্তি দেওয়া এ আইনের উদ্দেশ্য নয়।[৩১]

সমস্যা হলো এ ধারার বিধান অনুযায়ী শিশুকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে 'শিশুটি যদি এত বেশী অবাধ্য অথবা অসৎ চরিত্রের হয় যে, তাকে কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ পদ্ধতিতে মামলাটির সুরাহা হতে পারে তাদের কোন একটিও তার জন্য উপযুক্ত নয়' সেক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া যাবে। এটি প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যতিক্রম ক্ষেত্রটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব অনুযায়ী শিশুর জানমালের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব রয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু সে শিশু, সে নিজের ভালমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নয়। সেহেতু অন্য কেউ তার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু এ ধারার মাধ্যমে শাস্তির উল্লেখ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, যদি কোনো আদালত কোনো শিশুকে কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে ঐ শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আটক রাখতে হবে, সাধারণ কারাগারে নয়। আইনটিতে শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদি বা আসামির সাথে একত্রে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও ধারা ৭০ এ কোন শিশু কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি পেলেও তাকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত না করে অপরাধ মুক্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসাবেই তাকে দেখতে হবে, এমনটিই বিধান রাখা হয়েছে। আইনটিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কোনো শিশু যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তবে তাকে সেই অপরাধের জন্য কখনোই চাকরির সুযোগ বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বা ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারার বিধান অনুসারে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৬৫ ধারার বিধান মোতাবেক ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত অবহিতকরণের বিষয়টি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৩২]

এসব বিশেষ বিধানগুলো স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, যদি কোনো শিশু সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য 'শাস্তি' পেয়েও থাকে, তবে এ শাস্তি প্রথমত একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত: এটি প্রচলিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় প্রদত্ত শাস্তির অনুরূপ নয় বরং এটি ভিন্ন আঙ্গিকের একটি পদক্ষেপ। তৃতীয়ত: কোনো শিশু দোষী মর্মে পূর্বে প্রমাণিত হলেও ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারা অনুসারে পুনরায় কৃত অপরাধের জন্য বর্ধিত শাস্তি দেওয়া যাবে না। একটি শিশুকে অপরাধ

জগত থেকে উদ্ধার করার অর্থ একজন অপরাধীর সংখ্যা কমানো এবং একজন সুনাগরিকের সংখ্যা বাড়ানো এটি হতে পারে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩৩]

**পর্যালোচনা ৮ : অপরাধী শিশুর আটক পরবর্তী কার্যক্রমের সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব**

শিশু আইনের ৫২ ধারায় শিশুকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, কোনো শিশু মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করলে ন্যূনতম দু'বছর এবং অনধিক দশ বছর মেয়াদে আটক রাখার জন্য কোনো প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ করতে আদেশ দিতে পারে। কিন্তু কোনোক্রমেই আটকের মেয়াদ শিশুর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আর বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু সমস্যা হলো কোন্ প্রক্রিয়ায় শিশুর আটককাল নির্ধারিত হবে এবং ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কোন্ ধরনের হবে, সে ব্যাপারে শিশু আইনে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। শিশু আইনের ৫৫ ধারায় শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক বিষয়ে বলা আছে,

১) কোনো প্রবেশন অফিসার অথবা কমপক্ষে সহকারী দারোগার পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি যে কোনো শিশু যার সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, সে অপরাধ করেছে বা করতে পারে তাকে কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে।

২) যে শিশুকে কোনো নিরাপদ স্থানে এরূপে আনা হয়েছে তাকে এবং যে শিশু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করতে চায় তাকে আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত আটক রাখা যেতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কোনো বিশেষ আদেশ না থাকলে এরূপ আটক রাখার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার বেশি হবে না, আটক স্থান হতে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদের বাইরে থাকবে।

আলোচ্য বিষয় হলো এ ধারা অনুযায়ী কোনো শিশু নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকলে প্রবেশন ও পুলিশ অফিসার তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এ ধারায় প্রবেশন অফিসারের এ ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই। যার ফলে শিশু সংশোধন ও উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।[৩৪]

**পর্যালোচনা ৯: শিশু -কিশোর অপরাধীদের মুক্তি বিষয়ে প্রক্রিয়াগত জটিলতা**

শিশু আইনের ৫৭ ধারায় কিশোর অপরাধীকে কিশোর আদালতে প্রেরণ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, শিশু সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা অনুরূপ কোনো অপরাধের বিচারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে যে আদালতে হাজির করা হয় সে আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে কোনো কিশোর আদালতে অথবা যেখানে কোনো কিশোর আদালত নেই সেখানে ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেবে, যাতে উক্ত আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করতে পারে। এ ধারায় অপরাধের

বিচারের জন্য শিশুকে কিশোর আদালতে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ধারার যথাযথ প্রয়োগ নেই।[৩৫]

এছাড়া এ আইনের ৬৭ (১) ধারায় বর্ণিত আছে, সরকার যে কোনো সময়ে কোনো শিশু অথবা কিশোর অপরাধীকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাস হতে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদানের আদেশ দিতে পারে। অথচ শিশু আইনে অপরাধী শিশুকে দুভাবে মুক্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। একটি হচ্ছে ৫৩ ধারা অনুযায়ী কিশোর আদালত থেকে এবং অপরটি হচ্ছে ৬৭ ধারা অনুযায়ী প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট থেকে। তবে এ ধারায় মুক্তিদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বিধান উল্লেখ নেই। তাই শুধুমাত্র প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে এ আইনের সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। ৬৭ ধারাতে শিশু অপরাধীকে সংশোধনী কেন্দ্র থেকে মুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট জটিলতা দেখা যায়। কিভাবে কোন্ বয়সে শিশুকে মুক্তি দেওয়া হবে তা এ আইনে স্পষ্ট উল্লেখ নেই । শিশু আইনে অপরাধী সাব্যস্ত শিশুর মুক্তির বিষয়ে এ সব পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।[৩৬]

শিশু আইনের ৬৮ (১) ধারায় উল্লেখ আছে, সরকার কোনো শিশু অথবা কিশোর অপরাধীকে এক প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস থেকে অন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলির আদেশ দিতে পারে। অথচ শিশু আইনে শুধুমাত্র ধারা ৬৩ (৩) ছাড়া কোথায় কি পরিস্থিতিতে, কেন এবং কখন শিশুকে বদলি করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে আইনের অন্য কোনো ধারায় উল্লেখ নেই।

**উপসংহার**

শিশু কিশোররা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে নষ্ট হয়ে যাক এবং ভবিষ্যতের সাবলীল ও সুস্থ সমাজ জীবনে প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য হতে পারে না। শিশু আইনটির মুখবন্ধে বলা আছে, '১৯৭৪ সালের শিশু আইন শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের পরিচর্যা এবং অভিযুক্ত কিশোরদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন পুনর্বিন্যস্ত ও সংশোধন করিবার সাপেক্ষে একটি আইন।' শিশু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করে শিশু - কিশোরদের দাগী অপরাধীদের সাথে আটক রাখা হলে শিশুরা আরো বড় ধরনের অপরাধী হয়ে উঠে। ফলে দেশে অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং কারাগারে প্রেরিত শিশুর মধ্যে সমাজের প্রতি শত্রুতামূলক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পরবর্তীতে তারা কারামুক্ত হয়ে সমাজের চোখে ঘৃনার পাত্র হয়ে পড়ে। তাই অপরাধপ্রবণ শিশু কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে আমাদের সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে চৌত্রিশ বছর আগে প্রণীত এ আইনটিতে সুষ্ঠু বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইনের বিশেষ ধারাসমূহ সংশোধন করা হলে শিশু অপরাধ দমনসহ সংশোধন, উন্নয়ন এবং অন্যান্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া প্রমুখ, সম্পা, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম,* (ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০২), পৃ. ২।

২. *Population Census 2001*, (Provisional) (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2003), pp. 322-711.

৩. শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা,* (ঢাকা: সেভ দি চিলড্রেন, ইউকে, ২০০৫), পৃ. ২।

৪. Shahdeen Malik, *The Children Act, 1974 : A Critical Commentary*, (Dhaka: Save the Children UK, 2004), p. 21.

৫. A Seminar paper on Protection of Child Rights and Safeguard and Juvenile Delinquents, Organized by Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association and World Vision, Phulpur ADP, Mymensingh, 28 May 2007, p. 3.

৬. *বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের অবস্থার অংশীদারীত্বমূলক পর্যালোচনা,* (ঢাকা: সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং সেভ দা চিলড্রেন ইউকে, ২০০৫), পৃ. ২।

৭. Borhan Uddin Khan and Muhammad Mahbubur Rahman, *Protection of Children in Conflict with the Law in Bangladesh*, (Dhaka: Save the Children, UK, 2008), p.15

৮. মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া প্রমুখ, সম্পা, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম,* (ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০২), পৃ. ১২।

৯. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার,* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০৬), পৃ. ৭।

১০. শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি,* পৃ. ৯।

১১. তদেব, পৃ. ৯।

১২. তদেব, পৃ. ২।

১৩. শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা,* (ঢাকা: সেভ দি চিলড্রেন, ইউকে, ২০০৫), পৃ. ১৯।

১৪. শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি,* পৃ. ৯।

১৫. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার,* পৃ. ৬৫।

১৬. মোঃ আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন,* (ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০৫), পৃ. ৩।

১৭. *কিশোর বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসা শিশু,* বিচারকগণের জন্য বেঞ্চবুক, Canadian International Development Agency , (Dhaka: UNICEF, 2005), p. 22-23.

১৮. A Seminar paper on Protection of Child Rights and Safeguard and Juvenile Delinquents, Organized by Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association and World Vision, Phulpur ADP, Mymensingh, 28 May 2007, p. 6.

১৯. শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ১৯।

২০. শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ৯।

২১. Kamal Siddiqu, *Better Days, Better Lives, Towards a Strategy for Implementing the Convention on the rights of the Child in Bangladesh*, (Dhaka: The University Press Limited, 2003), p. 7.

২২. শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ২০।

২৩. *Juvenile Justice in South Asia: Improving Protecction for Children in Conflict with the Law*, (Dhaka: UNICEF, 2006), p. 39.

২৪. Mohammed Sadeque, "Juvenile Court for Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. IV, (1979-80), p.47.

২৫. ড. মোহাম্মদ সাদেক, অপরাধ ও সংশোধন, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯), পৃ. ২২৭-২২৯।

২৬. Halim, M Abdul, *Children: Role of Voluntary Organisations in the Protection of Human Rights at the Grassroots*, (Dhaka: The Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights, 1996), p. 113.

২৭. ডক্টর মোহাম্মদ সাদেক, পৃ. ২২৮।

২৮. তদেব, পৃ. ২২৯।

২৯. Dr. Sumaiya Khair, "Juvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review", *Journal of the Faculty of law*, The Dhaka University Studies Part-F, Vol. 16 no. (2005), p. 12.

৩০. Barrister Nihad Kabir, *Juvenile Justice Administration in Bangladesh: Laws and their Implementation*, in *An Anatomy of BILIA Judicial Training with Difference*, Edited by Rahman, Wali-ur and Shahabuddin, Mohammad, (Dhaka: Bangladesh Institute of Law and International Affairs, 2005), p. 218.

৩১. শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ২২।

৩২. তদেব, পৃ. ২৪।

৩৩. শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ৬৫।

৩৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট, ২০০৫, পৃ. ৮।

৩৫. তদেব, পৃ. ৬।

৩৬. তদেব, পৃ. ৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫-১২১

# ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

মোঃ নূরুল আমিন

॥ নয় ॥

পূর্ববর্তী কিস্তিতে সউদী আরবের পানি আইন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। এই কিস্তিতেও আমরা তা অব্যাহত রেখেছি। উল্লেখ্য যে সউদী আরবে প্রচলিত ইসলামী আইন অনুযায়ী পানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার তালিকায় গৃহস্থালী কাজকে প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে, দ্বিতীয় স্থানে আছে গৃহপালিত পশুর গোসল ও পানীয় চাহিদা এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চাষাবাদের কাজে পানির ব্যবহার। সউদী পানি আইন অনুযায়ী শিল্প কারখানার কাজে পানির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার তালিকায় ৪র্থ স্থান, চিত্ত বিনোদনমূলক কাজকে ৫ম এবং অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারকে ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই যে পানির প্রস্তাবিত এই ব্যবহার জাতীয় পানি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সউদী সরকারের মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে কুয়া বা নলকূপ স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত এলাকা

(২) কূপ থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত বাসিন্দাদের সংখ্যা। এতে এই সুবিধাপ্রাপ্তদের সংখ্যা যেখানে ১২০০০ বা তদূর্ধ্ব হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেখানে নলকূপ স্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবে ১৫০০ থেকে ৩০০০ বাসিন্দা সম্পন্ন এলাকা। ১০০০ থেকে ১৫০০ লোক অধ্যুষিত এলাকা তৃতীয়, ৫০০ থেকে ১০০০ লোক বসবাসকারী এলাকা চতুর্থ এবং ৫০০ এর কম বাসিন্দা সম্পন্ন এলাকা অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে আনুপাতিক সুবিধা পাবে।

(৩) খাবার পানির জন্য কুয়া খননের আবেদন অনুমোদনের প্রাক্কালে মন্ত্রীপরিষদ কমিটি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন তার মধ্যে রয়েছে খনন স্থানের উপযোগিতা, পানির উৎস থেকে জনবসতির দূরত্ব এবং সেখানে পানি প্রাপ্যতার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের মাথা পিছু প্রতিদিনের ন্যূনতম পানি চাহিদা ১০ থেকে ১৫ গ্যালন ধরা হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তিতে কুয়ার ডিজাইন তৈরি হয়। স্রোতস্বীনী বা ওয়াদি থেকে কৃষকদের সেচের পানি নেয়ার ব্যাপারেও একটি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এই নীতির উৎস হচ্ছে এলাকার ঐতিহ্য বা কাষ্টম। এক্ষেত্রে যাদের উজানে জমি আছে তারা ভাটি এলাকার জমি মালিকদের উপর প্রাধান্য পান অর্থাৎ উজানের কৃষকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেচের পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারেন।

---

লেখক ঃ সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

### পানি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন

সউদী আরবে প্রচলিত ইসলামী আইন ও প্রথা অনুযায়ী পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৃষ্ণা নিবারণ ও গৃহস্থালী কাজ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এই আইন অনুযায়ী নিজের এবং পোষ্যদের বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি যে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে। বলা বাহুল্য নিজের ও পরিবারের পানি চাহিদা নিরূপণের সময় পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত দৈনিক মাথা পিছু ১০-১৫ গ্যালন পানি চাহিদাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই আইনের বিধান অনুযায়ী সর্বসাধারণের জন্য খননকৃত কূপ, নালা, স্রোতস্বীনী বা ওয়াদী থেকে গৃহকাজে ব্যবহার্য পানি সংগ্রহ করতে হয়। একই ভাবে একই উৎসের পানি বা বেসরকারীভাবে খননকৃত কুয়া, নালা বা ওয়াদির পানি দিয়ে গবাদি পশুর গোসলের কাজও সম্পাদন করা যায়; তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে বেসরকারী উৎসের বেলায় পর্যাপ্ত অতিরিক্ত পানি থাকতে হবে এবং তা গবাদি পশুর গোসল সংশ্লিষ্ট জলাধারের মালিক বা ব্যবহারকারীদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারবে না।

### কৃষি কাজে ব্যবহার

খাল নদীনালা ওয়াদীতে পড়া এবং জমিতে জমা হওয়া বৃষ্টির পানি ব্যবহারের অধিকার সকল ভূমি মালিকের রয়েছে। এই পানি ব্যবহার নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষ ঃ

ক) জমির আকার, শস্যের ধরন ও মওসুম বিবেচনায় যে পরিমাণ পানি প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট কৃষক তার অতিরিক্ত পানি নিতে পারবেন না।

খ) বিদ্যমান প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসরণ করেই অতিরিক্ত পানি অবমুক্ত করতে হবে।

গ) পানি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে অপরাপর ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

যেখানে কুয়া বা ঝরনা থেকে সেচের পানি নেয়া হয় সেখানে ব্যবহারকারীদের এই উৎসগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে পার্শ্ববর্তী জমি বা ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আবার এই বিষয়টিও তাদের নিশ্চিত করতে হয় যে তারা সেচ কাজে অবহেলা প্রদর্শন করবে না যাতে পানির অভাবে মাটি শুকিয়ে বালুর সৃষ্টি হয়ে পার্শ্ববর্তী চাষাধীন জমিতে উড়ে গিয়ে ফসলের ক্ষতি করতে পারে। আলহাসা প্রকল্পে এর বাস্তব অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বালুর কবল থেকে কৃষি জমি রক্ষার জন্য গাছপালা লাগানো বাধ্যতামূলক করেছেন। জমিকে লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করার জন্যও প্রকল্প এলাকায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জিযান সেচ প্রকল্পেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

### পানির ক্ষতিকর প্রভাব

সউদী আরবের পানি আইনে পানির ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান না থাকলেও বন্যা ও ভূমি ধস নিয়ন্ত্রণ এবং বাঁধ সংরক্ষণের জন্য ইসলামী আইন ও প্রচলিত বিধিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় পানি কমিটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পানিকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

### ভূগর্ভস্থ পানি সংক্রান্ত আইন

দেশাচার ভিত্তিক প্রচলিত আইন অনুযায়ী সউদী আরবে নলকূপ খনন পরিচালনা ও সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে ভূগর্ভস্থ পানির স্বত্ব ও অধিকার নির্ণিত হয় ইসলামী আইন অনুযায়ী। এছাড়াও সরকারী জমি বন্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট নলকূপ খননের কাজও ইসলামী আইন নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনে কূপ খননকারীদের কারিগরি যোগ্যতা, একটি কূপ থেকে আরেকটি কূপের দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এতে দু'টি কূপের ন্যূনতম দূরত্ব ধরা হয়েছে ৫০০ মিটার। সংরক্ষিত জোন ও এলাকায় নলকূপ স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সউদী সরকার বিশেষ আইন বলে রিয়াদ, মদীনা এবং তায়েফ শহরকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছেন এবং এই শহরগুলোতে নলকূপ খনন নিষিদ্ধ করেছেন। দেশটির পানি বিধিতে পানির ঘাটতি সম্পন্ন এলাকাসমূহ জরিপ করে তার তালিকা প্রকাশের ভার জাতীয় পানি কমিটির উপর অর্পণ করা হয়েছে।

### রাষ্ট্রীয় পানি প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন

সউদী আরবে শরীয়া আইন প্রচলিত রয়েছে। সেখানকার সরকার ব্যবস্থাকে এই মর্মে ইসলামী বলা হয় যে, এই দেশটির প্রতিষ্ঠাতাকে বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত করার আগে পবিত্র কা'বা ও মদীনা শরীফের ইমামত তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। বাদশাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য শরীয়ার আলোকে নির্ণিত হয়। দেশ পরিচালনায় তাকে আইন অনুসরণ ছাড়াও দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ পরিষদের পরামর্শও মেনে নিতে হয়। রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতার পরিসর স্থির করা হয়। মন্ত্রী পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছাড়াও আইন প্রণয়নও নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে। ১৯৬৩ সালের ৩রা অক্টোবর বাদশাহ কর্তৃক জারিকৃত এক ফরমানের ভিত্তিতে সউদী আরবের বিভিন্ন প্রদেশ এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক কাঠামো বাস্তব রূপ লাভ করতে শুরু করে। এর ফলে প্রাদেশিক গভর্নররা সরাসরি ইনটেরিয়ার মিনিষ্ট্রির নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন। শরীয়া আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব হচ্ছে গভর্নরের। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সহযোগিতায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বাণিজ্য, জনশক্তি, শ্রম ও শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

সউদী গ্র্যাণ্ড মুফতির সামগ্রিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণে সে দেশের বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং তারই নির্দেশনায় আদালতের বিচারকরা দেওয়ানী ফৌজদারী সহ যাবতীয় মামলায় ইসলামী আইন প্রয়োগ করেন। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথমে জেলা আদালতে ও পরে প্রাদেশিক আদালতসমূহে আপীল শুনানী হয়। গ্র্যাণ্ড মুফতি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং তার আদালতই হচ্ছে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। এছাড়াও সময় সময় বাদশাহর দফতর ও আপীল আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলি 'দেওয়ান আল মাজালিম' হিসাবে পরিচালিত বিশেষ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল দেখা শোনা ও পর্যালোচনা করে থাকে। ১৯৫৫ সালে এই ট্রাইবুনালটি গঠিত হয়েছিল। প্রাপ্ত অভিযোগ নিবন্ধন ও তদন্ত করতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে রিপোর্ট প্রেরণ এই ট্রাইবুনালের অন্যতম কাজ।

## জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান

কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সউদী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান মন্ত্রণালয়। একজন ডেপুটি মিনিষ্টার এই মন্ত্রণালয় দেখা শোনা করেন। তার অধীনে একজন সহকারী ডেপুটি মিনিষ্টার রয়েছেন। কৃষি উন্নয়ন ও পানি সম্পদ উন্নয়ন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ কর্ম দেখার জন্য এখানে রয়েছেন দুজন মহাপরিচালক। পানি সম্পদ বিভাগের অধীনে নিম্নোক্ত অধিদফতর সমূহ রয়েছে এবং মহাপরিচালক এগুলো তদারকীর দায়িত্ব পালন করেন।

অধিদফতর গুলো হচ্ছে ঃ

১। পানি সংরক্ষণ

২। পানি সম্পদ উন্নয়ন

৩। পানি পরিসেবা

৪। পানি সম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন

উপরোক্ত অধিদফতরগুলো ছাড়াও একটি ভূমি উন্নয়ন বিভাগ পানি সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি সমাধানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের প্রণিত ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পানিনীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। এই মন্ত্রণালয় তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাবতীয় কাজ কর্ম অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এই মন্ত্রণালয় গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা ইনটেরিয়র মিনিষ্ট্রি। এই মন্ত্রণালয়টি বর্জ্য পানি সংগ্রহ ও পরিশোধন এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের তদারকের জন্য দায়ী। এছাড়াও রয়েছে অর্থ ও জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং গ্র্যাণ্ড মুফতির দফতর। এই দফতরটি বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে।

সউদী পানি আইনে পানি সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ বিভাগের মহাপরিচালক, অর্থ ও জাতীয় অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী, ডেপুটি গ্র্যান্ড মুফতি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এবং হিজাজ, নজদ, আসির এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের কৃষি ও শিল্প খাতের প্রতিনিধি হিসেবে রাজকীয় আদেশ বলে মনোনীত চারজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত। রাজকীয় সউদী আরবে একটি সামগ্রিক পানি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ের পানি স্বত্ব সংক্রান্ত বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের জন্য কারিগরী ও প্রশাসনিক পদ্ধতি জারী, নলকূপ বা কুয়া খনন, সম্প্রসারণ উন্নয়ন কিংবা বন্ধ করা অথবা সীল গালা করার ব্যাপারে নীতিমালা তৈরী ও তা বাস্তবায়ন, কূপ খননের জন্য নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন এলাকায় কূপের গভীরতা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণী তৈরী, বিধি বহির্ভূতভাবে নির্মিত স্থাপনা অপসারণ, জনস্বার্থে বিদ্যমান পানি স্বত্বের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সামগ্রিক লোনা পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে স্থাপনা তৈরী ও তার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি হচ্ছে জাতীয় পানি কমিটির প্রধান প্রধান কাজ। শরীয়া নির্দেশিত পথে দেশের মানুষের গৃহস্থালী কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও ধর্মীয় চাহিদার ভিত্তিতে

পানি চাহিদা নিরূপণ এবং তা পূরণের জন্য সম্ভাব্য উৎসের সন্ধান এবং নির্ধারিত সময় ও স্থানে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা সউদী পানি আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখেই জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে পানি সংক্রান্ত কমিটি সমূহের দায়িত্ব নির্ণয় করা হয়েছে।

**প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান**

প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাদেশিক পরিষদের ক্ষমতাবলী গভর্নররা ভাগাভাগি করেন। পানি সম্পদ সেচ অথবা অভ্যন্তরীণ এবং গৃহস্থালী কাজের জন্য পানির ব্যবহার জনগণের চাহিদা, অভাব অভিযোগ অথবা সরকারী পরিকল্পনা স্বয়ং গভর্নররা নিজেরাই পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রণালয় পানি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করলেও কার্যত প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পানি আইনের অধীনে গঠিত ওয়াটার রাইটস্ ডিপার্টমেন্ট স্থানীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা এমনভাবে ভাগাভাগি করে দিয়েছে যে পানি সংক্রান্ত মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তথাপিও যদি এক্ষেত্রে কোনও বিরোধ বা সমস্যা দেখা দেয় তা হলে প্রধান মুফতির নেতৃত্বাধীন বিচার বিভাগই তার মীমাংসা করে দেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সউদী আরবের বিচার ব্যবস্থায় শরীয়া আইন অনুসরণ করা হয় এবং পানি ও সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় বিরোধ শরীয়া সম্মতভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যাপারে বুখারী শরীফের একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। (বাব ৮ নং ২৩৬২)

উরওয়া ইবনে জুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত ঃ আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আল হাররা থেকে প্রবাহিত একটি নালার পানি খেজুর বাগানে সরবরাহকে কেন্দ্র করে জুবায়ের রা. এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। রসূল স. বলেন, হে জুবায়ের! তুমি পানি সেচ করো। তিনি তাকে ন্যায় ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও। তাতে আনসারী বললো, সে আপনার ফুফাতো ভাই কিনা! তার কথায় রাসূল স.-এর মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পানি সেচ করো। তারপর তা আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো। এভাবে তিনি তার প্রাপ্য পূর্ণ করে দিলেন। জুবায়ের বলেন, আল্লাহর শপথ! এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ করে..." (সূরা আল নিসা ঃ ৬৫)। ইবনে শিহাব (র) আমাকে (ইবনে জুরাইজ) আনসারগণ এবং অপরাপর লোকজন নবী স.-এর কথা বললেন, "তুমি পানি সেচ কর তারপর তা আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো।"

এ হাদিস থেকে পরিষ্কার যে অতিরিক্ত পানি প্রবাহ বন্ধ রেখে লোকদের তা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত রাখা জায়েজ নয়। পানির প্রবাহ বন্ধ রাখলে গাছপালা, তরুলতা, ঘাস ইত্যাদি জন্মাতে পারে না। এতে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী শরীয়া তিনটি অবস্থাতে পানি আটকে রাখাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এই তিনটি অবস্থা হচ্ছে ঃ যেখানে পানির কোনও বিকল্প নেই, যেখানকার পানি গবাদি পশু ব্যবহার করে এবং যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে। সউদী পানি নীতিতে শরীয়ার এই নীতিমালার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে গৃহস্থালী, সেচ এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে পানি সংগ্রহ, ব্যবহার, বিতরণ ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সম্ভবত মালয়েশিয়া হচ্ছে অন্যতম প্রধান দেশ যেখানে ফেডারেল ও রাজ্য বা প্রাদেশিক পর্যায়ে পানি আইন ও বিধি বিধান সামগ্রিক রূপ পেয়েছে। বলা বাহুল্য ১৩টি রাজ্য নিয়ে এই দ্বীপ দেশটি গঠিত। পূর্ব মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ও সাবাহ্ প্রদেশ ছাড়া অবশিষ্ট রাজ্যসমূহে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এবং জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ মুসলমান, সুন্নী, সাফেয়ী মাজহাবভুক্ত। মালয়ীদের জীবন যাত্রায় হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও এবং কনফুসিয়ান ধর্ম মতের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মালয়েশিয়ার ইতিহাসকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল, হিন্দু বৌদ্ধ আমল, মুসরিলম শাসনামল এবং বৃটিশ স্বাধীনতা উত্তর কাল।

ধারণা করা হয় যে চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঐ অঞ্চলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে মালয় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। কৃষি কর্ম, কাঠ খোদাই এবং হস্তশিল্প প্রভৃতি ছিল তাদের প্রধান পেশা, খৃষ্টের জন্মের এক শতাব্দীর মধ্যে মালয়েশিয়া অঞ্চলে সেচ ভিত্তিক ধান চাষ, পশু পালন, ফলমূল ও তরিতরকারীর চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শতাব্দীর শুরুতেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারত বর্ষের আদলে অসংখ্য নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হিন্দু দর্শনের প্রভাবও ব্যাপকতা লাভ করে এবং মালয়েশীয় গ্রামগুলোতে তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে এবং স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমূহ বণিক শ্রেণী ও নগর রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তৎকালীন ভারত বর্ষের হিন্দু রাজাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দর্শন অবস্থান্তর প্রাপ্তির এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের একই রাজ্য শ্রীবিজয়া, মালাক্কা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ধনী ও ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্যটি পরবর্তীকালে দক্ষিণ সুমাত্রায় রাজধানী স্থাপন করে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং সমগ্র মালয় উপদ্বীপকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। ৭ম শতাব্দীতে এটি বৌদ্ধদের অধীনে চলে যায়। একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই উপদ্বীপ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য বন্ধনের পাদপিঠে পরিণত হয়। এই সময়ে তারা ইউরোপে মালাক্কার মসলাপাতি সরবরাহ করতো এবং চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় পণ্যসামগ্রী পরিবহন ও বিক্রি করতো। আরব এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মালয় উপদ্বীপে অসংখ্য বন্দর ও বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলের দ্বীপসমূহ থেকে তারা মসল্লা সংগ্রহ করে পূর্ব জাভার উত্তর উপকূলে নিয়ে আসতেন। ভেনিস এবং পূর্ব জাভার সাথে তখন তাদের নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মসল্লার ব্যবসার উপর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উত্তরের থাইমার ও থাই এবং দক্ষিণের জাভার মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের জের ধরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম মালয় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা-বাহুল্য মুসলিম বণিক ও আলেম ওলামাদের প্রভাবে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে। মূলত তাদের সততা, নিষ্ঠা ও মানুষের প্রতি দরদ এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখে এই উপদ্বীপের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। মুসলিম বণিকদের প্রভাবে ইসলাম সমগ্র দ্বীপ পুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে, মালয়ী ভাষা ব্যবসা বাণিজ্যের বাহনে পরিণত হয় এবং এভাবে বাহাসা মালয়েশিয়ার রাষ্ট্র ভাষার রূপ লাভ করে। এই সময়েই মালয়েশিয়ায়

বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় প্রশাসন সম্বলিত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হয় যা আজো সেখানে প্রচলিত রয়েছে। এই সরকারের অধীনেই মালয়েশিয়ায় ইসলামী আইন ও বিধি বিধান চালু হয়। মুসলিম শাসনের একশত বছর ছিল মালয় উপদ্বীপের সমৃদ্ধির একটি শতাব্দী। এরপর বেনিয়া বৃটিশদের লোলুপ দৃষ্টি এই অঞ্চলের উপর পড়ে। মালাক্কা প্রণালী নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ, সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশরা পরপর মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয়। ১৮২৪ সালে এংলো-ডাচ চুক্তি অনুযায়ী মালয়েশিয়া দ্বীপ পুঞ্জে গ্রেট বৃটেনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশরাই স্থায়ীভাবে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক বিভাজন চূড়ান্ত করে দেয়। ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে মালয়েশিয়ায় বৃটিশরা ভূখণ্ড দখলের চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্যেই বেশী আগ্রহী ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তারা সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পেনাং প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে সেগুলোর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বৃটিশ ইস্ট এশিয়া কোম্পানীর উপর ছেড়ে দিয়েছিল। ১৮৭০ এর দশকে এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমাঞ্চলে বিশাল টিনের খনি আবিস্কৃত হওয়ায় তাদের নীতি পলিসি পরিবর্তিত হয়। ১৮৬৭ সালে তারা সিঙ্গাপুর মালাক্কা এবং পেনাংকে সরাসরি মহারাণীর শাসন কর্তৃত্বে নিয়ে যায়। ১৮৭৪ সালে পারাককে বৃটিশের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য করা হয়। এরপর সেলেঙ্গার নাগরী, সেমবিলান এবং পাহাং রাজ্যেরও একই পরিণতি ঘটে। পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি রাজ্যে স্থানীয় একজন সুলতানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কার্যত বৃটিশরাই শাসন ক্ষমতা চালাতে থাকে। উপনিবেশিক গভর্নরের নিকট সুলতানরা জবাবদিহি করতেন। জায়গীরদারী প্রথা ও করারোপ, দাশ প্রথা এবং জমিদারদের যথেচ্ছাচার বিলোপ করে ভারত বর্ষে প্রবর্তিত বৃটিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনুরূপ বৃটিশ আইন মালয়েশিয়াতেও প্রবর্তিত হয়। এর প্রভাব সুলতানী আমলে প্রবর্তিত ইসলামী আইনের উপরও পড়ে এবং পানি আইনসহ সামগ্রিকভাবে দেওয়ানী আইন ও বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তবে এই পরিবর্তন সত্ত্বেও পানি আইনের মূলনীতি সেখানে অক্ষুণ্ন থাকে। পরবর্তী কিস্তিতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো।

### গ্রন্থপঞ্জি


1. Kingdom of Saudi Arabia, *Wakuti Report on Al Hasa* Part ii, chapter iv and Sir William Hailro and Partners, *Report on Wadi Jisam Irrigation project,* 1972.
2. Operational Procedure of the Distribution of Public Land Ordinance, Royal Decree 1958, KSA.
3. Royal order no 17687 of Aug 19, 1391 A.H. order no 8949, 1391 A.H. no 7553, 1387 A.H.
4. Royal Decree of 17 May 1958.
5. Ahmed Assah, *Miracle of the Desert Kingdom,* London, 1969.
6. Abdul Fattah Memon, *Oil and the Faith, Pakistan,* 1966.
7. Gerald de Gaury, *Faisal : King of Saudi Arabia,* London 1966.
8. *Middle East Journal,* January 27, 1973.
9. *Area Handbook for Malaysia,* the American university, 1970.

*ইসলামী আইন ও বিচার*
*জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮*
***বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ১২২-১২৫***

# এদেশে এমন কোন আইন ও নীতি ফলপ্রসূ হবে না যা কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী

**॥ আইন ও বিচার প্রতিবেদন ॥**

১৪ মে ২০০৮ বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভি.আই.পি লাউঞ্জে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' এর উদ্যোগে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঃ জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির ভাষণে সাবেক বিচারপতি আবু সাঈদ আহম্মদ বলেন, এদেশে এমন কোন আইন ও নীতি ফলপ্রসূ হবে না যা কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকের মডারেটর ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ আব্দুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন, সাবেক মন্ত্রী বিশিষ্ট রাজনীতিক সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক, মাওলানা রুহুল আমীন খান, মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, প্রফেসর ড. এইচ.এম হিজবুল্লাহ, বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম, অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের, সাবেক এম.পি এডভোকেট ফেরদৌস আক্তার ওয়াহিদা, সাবেক এম.পি রাশেদা বেগম হীরা, প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ, ড. মতিউল ইসলাম, মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নাদভী, মাওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী, বিপ্লবী নারী মঞ্চের সভানেত্রী রাফিয়া বেগম কাকলী, আয়েশা সিদ্দিকা বকুল প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি জাতিই একটি আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। আদর্শহীন জাতি জগতে টিকে থাকতে পারে না। এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে সমুন্নত রেখে নারী নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্যে জোরদার জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

**ড. আব্দুল মা'বুদ** বলেন, সর্বক্ষেত্রেই কুরআনের বিধান মানতে হবে। বিশেষ করে অধিকার প্রশ্নে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। যেমনটি পাশ্চাত্যে ভেঙে পড়েছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। শুধু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরুষকে কিছুটা বেশী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান নারী নীতির অনেক গুলো ধারাকে বদলাতে হবে।

**রাশেদা বেগম হীরা** বলেন, নারী নীতিতে পারিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। অথচ নারী হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে আমি পুরুষের চেয়ে অধিকার পাই, সেক্ষেত্রে আমি কম নিতে যাবো কেন? তিনি বলেন, আমার মোহরানা, আমার রোজগার ইত্যাদিতে সমান দিলে তো আমার ক্ষতি হবে। হীরা আরো বলেন, পৈত্রিক সম্পদে ভাইয়ের অর্ধেক পেয়ে আমি সন্তুষ্ট কারণ কুরআন যে সাম্য ও সমতা নারী পুরুষের মধ্যে বিধান করেছে এটিই বাস্তব। কারণ নারী নীতির ৩.২ ধারায় এদেশের অসচেতন মানুষকে ধোকা দেয়া হয়েছে। নারী নীতির ৯.১৩ ধারায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের

কথা বলতে গিয়ে এমন দ্বান্দিক ও অস্বচ্ছ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। **মাওলানা মুহাম্মদ মূসা** বলেন, আমাদের দেশের অনেক নীতি ও আইন পাশ্চাত্য দর্শনকে সামনে রেখে করা হয় যেগুলো কোন মুসলমানের পক্ষে মানা সম্ভব নয় অথচ আমাদের সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিধান রচনার কথা বলা হয়েছে। নারী নীতি তৈরীর ক্ষেত্রে তাও মানা হয়নি, ফলে সংবিধানও লঙ্ঘিত হয়েছে।

**এডভোকেট ফেরদৌস আক্তার ওয়াহিদা** বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালার কিছু ধারা আমাকে মারাত্মক ভাবে আহত করেছে। কারণ পাশ্চাত্যের অসংখ্য নারী আজ ইসলামের আদর্শের স্থায়াতলে আসার জন্যে উন্মুখ আর আমরা আমাদের শাশ্বত আদর্শকে ক্ষুন্ন।

তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন রাখেন, সিডও বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা কি কুরআনের শাশ্বত বিধানগুলোকে ধ্বংস করে দেবো?
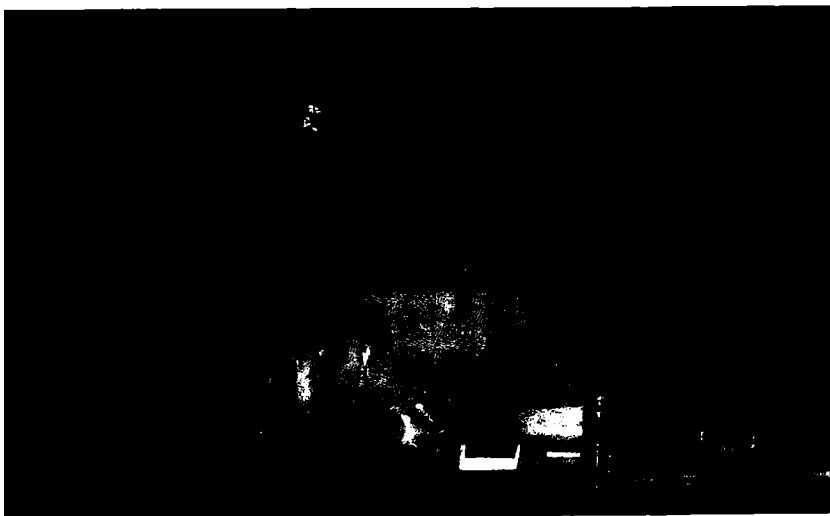
*গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন সাবেক বিচারপতি আবু সাঈদ আহম্মদ।*

তিনি বলেন, কুরআনই নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নারী শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। যাতে নারীর সব অধিকারের বিধান বিবৃত হয়েছে। আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া বিধান বুঝতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা পাশ্চাত্যের নীতি চাই না, আমরা বরং সরকারের কাছে কুরআনের দেয়া নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চাই। তাহলেই নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।

**অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের** বলেন, কুরআন সম্মত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীরা যদি এগিয়ে আসেন এবং পাশ্চাত্য আদর্শে বিভ্রান্ত নারীদের প্রতিবাদে সংগঠিত ও সোচ্চার হোন তাহলে নারীদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। বর্তমান নারী নীতি দেশের জনতা মেনে নেয়নি। সমান

অধিকারের নামে আমরা সীমা লঙ্ঘন করতে চাই না, আমরা কুরআন সুন্নাহ মতো সুষম নীতি চাই। এজন্য নারী পুরুষ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও একমত হতে হবে এবং সরকারকে অধিকাংশের মতামত উপলব্ধি করতে হবে।

**ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম** বলেন, সরকারের নারী নীতিতে সিডও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এগুলো শুধু কুরআনের সাথেই সাংঘর্ষিক নয় আমাদের সংবিধানেরও বিরোধী।

সৈয়দা বেগম রাজিয়া ফয়েজ বলেন, এই নারী নীতি দ্বান্দ্বিক নীতি। এটি সমাজে বিরোধ সৃষ্টি ও নারীর দুর্গতি ছাড়া কোন উন্নতি করবে না। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন এই দেশে বাস্তবায়ন করতে কখনো দেয়া হবে না। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করবেন না।

*গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্টজনের একাংশ।*

বর্তমান সরকার পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায় অনেক কিছুই চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে বলেন, মূল দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগী হোন।

- ❑ ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বলেন, ইসলাম নারীকে মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়েছে। ইসলাম নারীকে স্বকীয়তা দিয়েছে। ইসলাম নারীকে স্বনামে পরিচিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে। অথচ তথাকথিত এদেশের আধুনিকা নারীরা নিজের পুরুষের নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে। অথচ মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে অনেক সাহাবীও গর্ববোধ করতেন।
- ❑ রাফিয়া বেগম কাকলী বলেন, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ❑ মাওলানা রুহুল আমিন খান বলেন, সরকার নারী নীতি তৈরী করেছে কিন্তু পুরুষনীতি কেন করেনি? আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারো বিধান মুসলমান মানতে পারে না। অতএব এদেশের ১৪

কোটি মুসলমানের বিশ্বাসের বিরোধী এই নারী নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে ইসলাম সম্মত করেই বাস্তবায়ন করতে হবে।

- প্রফেসর ড. এইচ.এম হিযবুল্লাহ বলেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন তার সৃষ্টির জন্য কেমন নীতি প্রয়োজন। ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনসহ শিক্ষা কর্ম সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমরা যদি পুরোপুরি ইসলামকে মানি ও বাস্তবায়ন করি তাহলে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন করে নীতি তৈরীর প্রয়োজন হবে না।
- উবায়দুর রহমান খান নাদভী বলেন, মানব জাতির যাকে যে অধিকার আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন তাই সুষম। এ ব্যাপারে গণসচেতনা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আর নারীর উন্নয়নের নামে নারীর মর্যাদা বিনষ্টের অপচেষ্টা সফল হবে না।
- মাওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী বলেন, নারী নীতি বিরোধী গণসচেতনতা এবং নারী পুরুষ সকল মহলের ঐক্যবদ্ধ এই উদ্যোগকে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগে পরিণত করা দরকার।
- মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী বলেন, সম অধিকারের দাবী না করে নারী নীতিতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করা উচিত ছিল। ইসলাম সমাজকে নৈতিক ভাবে স্বশাসিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আইন দ্বারা ইসলাম সমাজকে শাসন করতে চায় না।
- আয়েশা সিদ্দিকা বকুল বলেন, মুসলিম নারীরা তাদের প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে জানে না। তাদেরকে অধিকার দেয়ার নামে যারা বিভ্রান্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারণা দরকার।

*- আবুশিকা মুহাম্মদ শহীদ*